বর্তমান পরিস্থিতি এবং গণআন্দোলনে প্রধান বিপদ

১৯৭০-এর দশকে ইন্দিরা কংগ্রেস পরিচালিত সরকারের শোষণ অত্যাচারের বিরুদ্ধে সারা ভারতবর্ষ জুড়ে জনসাধারণের ক্রোধ ও ঘৃণা প্রায়ই স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনে ফেটে পড়ছিল। দলের ২৭তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে এই ভাষণে কমরেড শিবদাস ঘোষ দেশের মূল রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও গণআন্দোলনগুলির সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করেন। বিশেষ করে বিহার ও গুজরাটে জনসাধারণ প্রবল বিক্ষোভে ফেটে পড়লেও বামপন্থী আন্দোলনের পীঠস্থান পশ্চিমবঙ্গে কোনও শক্তিশালী আন্দোলন গড়ে উঠছে না কেন, তিনি তার বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা করেন। পুঁজিবাদী শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে সমাজের সমস্ত স্তরের মানুষকে নিয়ে ঐক্যবদ্ধ, দীর্ঘস্থায়ী আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য তিনি জনগণকে আহ্বান জানান।

কমরেড সভাপতি ও উপস্থিত বন্ধুগণ,

আমাদের দল এস ইউ সি আই-এর সাতাশতম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে আয়োজিত আজকের এই জনসভায় ভারতবর্ষের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে আমাদের দলের মতামত ব্যক্ত করতে আমাকে বলা হয়েছে। এছাড়া অন্যান্যবারের মতো এবারেও বহু বন্ধু এবং জনসাধারণের কাছ থেকে বেশ কিছু অনুরোধ সংবলিত চিঠি ও মৌখিক অনুরোধ আমার কাছে এসেছে নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা করার জন্য। যেমন, আন্তর্জাতিক সমস্যার বিভিন্ন দিক, চীনে লিন পিয়াও-এর ঘটনা, ভারতবর্ষের পরিস্থিতি — বিশেষ করে বিহার এবং গুজরাটে আন্দোলন হওয়া সত্ত্বেও পশ্চিমবাংলায়, যে পশ্চিমবাংলা বামপন্থী আন্দোলনে সমস্ত ভারতের মধ্যে অগ্রগণ্য বলে বিবেচিত সেখানে তেমন জোরদার প্রতিরোধ আন্দোলন না গড়ে ওঠার কারণ কী — এ সব বিষয়ে আমাকে আলোচনা করতে অনেকে অনুরোধ করেছেন। এইরকম আরও অনুরোধ এসেছে আমাদের দেশের বেকার সমস্যার ভয়াবহতা নিয়ে আলোচনা করবার জন্য এবং কী করে এই বেকার সমস্যা দূর করা যায় তার উপর আলোচনা করবার জন্য। তাছাড়া আমাদের দেশে রামমোহন থেকে বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, নজরুল পর্যন্ত যতটুকু রেনেসাঁসের আন্দোলন হয়েছে, সেই রেনেসাঁসের আন্দোলন এবং স্বাধীনতা আন্দোলনে বহু মনীষী, বহু প্রতিষ্ঠাবান আত্মত্যাগী রাজনৈতিক নেতা এবং বাংলার বিপ্লবীদের জীবনদান সত্ত্বেও অন্যান্য দেশে রেনেসাঁসের এইসব চরিত্র এবং তাঁদের কার্যকলাপের প্রভাব সমাজজীবনে যেখানে বহুদিন পর্যন্ত বর্তেছে এবং তার প্রভাব লক্ষ করা গিয়েছে, ভারতবর্ষে এতসব কৃতী মনীষীর জন্ম হওয়া সত্ত্বেও এবং তাঁদের জীবন আমাদের সামনে থাকা সত্ত্বেও ভারতবর্ষের সমাজজীবনে তার কোনও প্রতিক্রিয়া লক্ষ করা যাচ্ছে না কেন — ইত্যাদি নানা প্রশ্ন নিয়ে আমাকে আলোচনা করতে অনেকে অনুরোধ করেছেন।

স্বভাবতই আমি আশা করব, এই সমস্ত প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করবার জন্য যাঁরা আমাকে অনুরোধ করেছেন, তাঁরা এই জনসভায় উপস্থিত আছেন। তাঁদের কাছে আমার একটা সবিনয় অনুরোধ এই যে, তাঁরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন, এই সমস্ত প্রশ্নগুলির এক একটি বিষয় নিয়েই বিস্তারিতভাবে আলোচনা করতে গেলে একটা জনসভায় যতটুকু সময় পাওয়া যায় তাতে চলে না। অথচ ভারতবর্ষে আজ যে জটিল রাজনৈতিক পরিস্থিতির সামনে আমরা দাঁড়িয়ে আছি এবং গণআন্দোলনের পরিস্থিতি বর্তমানে যে স্তরে রয়েছে, কী করে সেই অবস্থার মোকাবিলা করা যায়, জনজীবনের সামনে আজ এইটিই মূল সমস্যা হিসাবে দেখা দিয়েছে। এই বিষয়টা এত গুরুত্বপূর্ণ যে, এর উপর আলোচনা আমাকে করতেই হবে এবং এর উপর প্রাধান্য আমাকে দিতেই হবে। ফলে, দেশের বর্তমান পরিস্থিতির পর্যালোচনা এবং জনসাধারণ হিসাবে আমাদের করণীয় কাজ কী, সে সম্বন্ধে মূলত আজকের জনসভায় আমার বক্তব্য আমি রাখব এবং এর সঙ্গে অন্যান্য প্রশ্নগুলির যতটুকু সম্বন্ধ আছে তেমন বিষয়গুলি নিয়ে খানিকটা আলোচনা করার সুযোগ থাকলে আমি করব।

বামপন্থী দলগুলো পশ্চিমবাংলায় শক্তিশালী হওয়া সত্ত্বেও আন্দোলন হচ্ছে না কেন

আপনারা সকলেই জানেন এবং লক্ষ করেছেন যে, গুজরাটে এবং বিহারে কীভাবে জনসাধারণের বিক্ষোভ একটা প্রচণ্ড বিস্ফোরণের রূপে ফেটে পড়েছে। সমাজের সর্বস্তরের নিপীড়িত মানুষ সেখানে এই আন্দোলনকে অকুণ্ঠভাবে সমর্থন করেছে। অন্যান্য রাজ্যে যেখানে যেখানে আজও ঠিক গুজরাট এবং বিহারের মতোই বিস্ফোরণ এখনও দেখা দেয়নি, আমি বলতে পারি, সেই সমস্ত রাজ্যেও মানুষের সহ্যের সীমা অতিক্রম করে যাচ্ছে এবং আজ হোক, কাল হোক, ভারতবর্ষের প্রায় প্রতি কোণেই বিক্ষুব্ধ জনতার বিস্ফোরণ দেখা দেবে। আন্দোলনে মানুষ ফেটে পড়তে বাধ্য হবে, তা সে দু'দিন আগে হোক, বা দু'দিন পরেই হোক। কিন্তু পশ্চিমবাংলার সমস্ত মানুষকে যে কথাটা ভাবাচ্ছে, তা হল এই যে, বামপন্থী আন্দোলন, বিপ্লবী আন্দোলন, গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পীঠস্থান যে পশ্চিমবাংলা, যে পশ্চিমবাংলার বহু ঐতিহ্য রয়েছে সংগ্রামের, যে পশ্চিমবাংলায় বামপন্থী দলগুলো সবচেয়ে শক্তিশালী, সেখানে আজও একটা জোরদার আন্দোলন গড়ে উঠছে না কেন? এই পশ্চিমবাংলায়, আপনারা সকলেই জানেন, দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়াশীল দল বলে যাদের বলা হয় তারা এখনও প্রধান শক্তি নয় এবং তাদের কোনও কার্যকরী ভূমিকাই এখনও পর্যন্ত এখানে নেই। এখানে রাজনৈতিক আন্দোলনে মূলত একপক্ষ শাসক কংগ্রেস, আর একপক্ষ যত মতপার্থক্যই থাকুক যারা কংগ্রেসবিরোধী বামপন্থী দল তারাই, জনসাধারণের নেতৃত্বে রয়েছেন। সংগঠন, প্রভাব, প্রতিপত্তি বলতে যা কিছু এই বামপন্থী দলগুলিরই এখানে রয়েছে এবং পশ্চিমবাংলায় এই বামপন্থী বলতে সাধারণত ইউ পি, বিহার বা ভারতবর্ষের অন্যান্য জায়গায় যাদের বোঝানো হয় তেমন শক্তি নয়। এখানে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী বলে পরিচয় দেন, সমাজতন্ত্রের কথা বলেন, এমন সব বামপন্থী দলগুলির প্রভাব-প্রতিপত্তি সবচেয়ে বেশি। তা সত্ত্বেও এই পশ্চিমবাংলায় আজও শাসক কংগ্রেসের বিরুদ্ধে আন্দোলন তেমন রূপ নিতে পারছে না কেন? সাধারণ মানুষকে এটাই সবচেয়ে বেশি আজ ভাবাচ্ছে। আমাকেও ভাবাচ্ছে। আমাদের দলকেও ভাবাচ্ছে। আপনাদের সকলকেও ভাবাচ্ছে। এর কারণ কী? এ প্রশ্নের উত্তর আমাদের দিতে হবে। সিদ্ধার্থবাবু বলে বসে আছেন যে, পশ্চিমবাংলায় যে আন্দোলন হচ্ছে না তার কারণ পশ্চিমবাংলার মানুষ লড়াই চায় না বা লড়াই চাইলেও বামপন্থীদের তারা পরিত্যাগ করেছে। তাঁর মতে বামপন্থী দলগুলোর প্রতি পশ্চিমবাংলার জনগণের যে আস্থা নেই — এটা তার একটা বড় প্রমাণ। তিনি আরও বলেছেন, যেহেতু কংগ্রেসের উপর পশ্চিমবাংলার মানুষের এখনও আস্থা রয়েছে, তাই এখানে বিক্ষোভ এখনও ফেটে পড়েনি। সিদ্ধার্থবাবুর যেমন বিবেচনা এবং বুদ্ধি তিনি তেমনই বলবেন, এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। কারণ, প্রত্যেক মানুষই তার আপন বুদ্ধি অনুযায়ী কথাবার্তা বলে থাকেন, তিনিও বলেছেন। কিন্তু আমাদের বিষয়টা নিয়ে ভাবতে হবে এবং এর একটা যথাযথ উত্তর বের করতে হবে।

অসংগঠিত, রাজনৈতিকভাবে অসচেতন জনতার বিক্ষোভ আন্দোলন বেশি দূর এগোতে পারে না

এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করবার পূর্বে আমি কতকগুলি কথা আপনাদের সামনে বলে নিতে চাই। আপনারা লক্ষ করেছেন, গুজরাটে জনসাধারণের সহ্যের সীমা অতিক্রম করার ফলে যে আন্দোলনে তারা ফেটে পড়ল, তা বেশি দূর এগোতে পারেনি। বিহারেও আন্দোলন আজ যে পথ গ্রহণ করেছে এবং সেখানে আন্দোলনের নেতৃত্ব কার্যকরীভাবে আজও যে শক্তিগুলোর হাতে রয়েছে, তার ফলে বিক্ষোভ, আত্মত্যাগ, গুলি খাওয়া, প্রাণ দেওয়া, সরকারি তরফ থেকে অত্যাচার, যত কিছুই যে পরিমাণে ঘটুক না কেন এরও পরিণতি বেশিদূর নয়। যে কথাটা এর দ্বারা আমি আপনাদের কাছে বলতে চাইছি, তা হল এই যে, অত্যাচার যতদিন থাকবে এবং যখন তা সহ্যের সীমা অতিক্রম করে যাবে, মানুষ মাঝে মাঝে বিক্ষুব্ধ হয়ে নেতৃত্ব থাকুক আর না থাকুক, আদর্শ ঠিক থাকুক আর না থাকুক, রাস্তা ভুল হোক, পথ ভুল হোক, নেতৃত্ব ভুল হোক, লড়াইয়ের ময়দানে এসে যাবে। এই লড়াই হবে। লড়াই হচ্ছেও। আপনারা মনে রাখবেন, ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষ কম রক্ত ঢালেনি। এ কথা যদি কেউ বলেন যে এদেশের মানুষ লড়তে জানে না, এদেশের মানুষ প্রাণ দিতে জানে না, এদেশের মানুষ পুলিশের বন্দুক দেখলে ভয়ে কুঁকড়ে যায় এবং গর্তে লুকিয়ে থাকে, তাহলে আমি বলব, আমি তাঁদের সঙ্গে একমত নই। তাঁরা এদেশের ইতিহাস, বিশেষ করে স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় থেকে শুরু করে দেশ স্বাধীন হওয়ার পরেও আজ পর্যন্ত যত আন্দোলন এদেশে ঘটেছে, যত আত্মত্যাগ

ও কোরবানি হয়েছে, যত অত্যাচার হয়েছে, যত লাঠি-গুলি চলেছে তার ইতিহাস হয় জানেন না, না হয় জেনে শুনে সেই ইতিহাস তাঁরা বিকৃত করছেন, অথবা তাঁরা সেই ইতিহাস বিস্মৃত হয়েছেন। আমি আপনাদের বলছি, আবারও এদেশের মানুষ লড়বে। আন্দোলন সম্পর্কে তাদের নিরাশা, হতাশা, অবিশ্বাস এবং রাজনৈতিক দলগুলির প্রতি তাদের আস্থাহীনতা যাই থাকুক, তারা কোনও দলের নেতৃত্বকে পছন্দ করুক না করুক, বা এই সমস্ত রাজনৈতিক দল কিছু করতে পারবে না, এরকম মনোভাবনা তাদের মধ্যে থাকলেও তারা বসে থাকতে পারবে না। কারণ, পেট বড় বালাই। অত্যাচার শোষণ যখন সহ্যের সীমা অতিক্রম করে যাবে তখন তারাও বোমার মতো ফেটে পড়তে বাধ্য হবে, আন্দোলন করতে বাধ্য হবে, মরবে এবং প্রাণ দেবে। কিন্তু আমি যা বলতে চাইছি, তা হচ্ছে, এর দ্বারা ফল কিছু হবে না। কারণ বিক্ষোভ, বিস্ফোরণ, স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলন যত ব্যাপকতা নিয়েই গড়ে উঠুক, অসংগঠিত, রাজনৈতিকভাবে অসচেতন জনতার শুধুমাত্র অ্যাজিটেশনাল ফর্ম অব মুভমেন্ট (বিক্ষোভের রূপে এই আন্দোলন) বেশিদূর পর্যন্ত এগোতে পারে না।

আপনারা লক্ষ করে দেখবেন, আমাদের দেশে স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় থেকে বুর্জোয়াদের নেতৃত্বে আন্দোলনের যে কৌশল চলেছে, এ আন্দোলনের প্রকৃতিও সেইরকম, অর্থাৎ মানুষকে রাজনৈতিকভাবে, সুষ্ঠু রাজনৈতিক লক্ষ্য সম্বন্ধে সচেতন করে, সংগঠিত করে, সংগঠিত রূপে প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলা নয়। এর প্রকৃতি হচ্ছে, মানুষের মধ্যে প্রচলিত শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ এবং লড়াইয়ের মনোভাব যখন দানা বাঁধতে থাকে, মানুষ কিছু একটা করবার জন্য অস্থির হয়ে ওঠে, তখন কিছু গরম ভাষণ দিয়ে তাদের উত্তেজিত করে রাস্তায় নামিয়ে দেওয়া। তারা সরকারের বিরুদ্ধে লড়তে থাকে, আর নেতারা মাঝে মাঝে কিছু কিছু লড়াইয়ের কর্মসূচি (!) দিতে থাকেন। নেতাদের গায়ে আঁচড়টিও লাগে না। বড় জোর একটা সরকার যদি অত্যন্ত ভয় পেয়ে যায়, বিব্রত বোধ করতে থাকে, বা একটু আনওয়াইজ (বেকুব) হয়, তাহলে নেতাদের ধরে নিয়ে গিয়ে 'আসুন স্যার' বলে জেলে পুরে দেয়। নেতাদের সেই জেলে যাওয়াটা একটা রাজনৈতিক ক্যাপিটাল (মূলধন) হয়। তাঁরা বেশ হাসতে হাসতে জেলে যান। গিয়ে সেখানে ডিভিশন ওয়ান প্রিজনার (প্রথম শ্রেণীর বন্দী) হন, আর জেলে তাঁদের অ্যালাউয়েন্স আরও বেশি পাওয়া দরকার কিনা তার জন্য লড়ালড়ি করেন। আবার দশ-পনেরো দিন বাদে গলায় মালা পরে বেশ মহাবীরের মতো বেরিয়ে আসেন এবং বেরিয়ে এসেই সরকারের বিরুদ্ধে রণহুঙ্কার দিতে থাকেন। আর নির্বাচন থাকলে তো কোনও কথাই নেই। তাঁরা বলতে থাকেন, এই সরকার কিছুই করেনি। আমরা লড়েছি, আমাদের ক্ষমতায় বসাও, সরকারি গদিতে বসাও। বসালেই একেবারে রামরাজত্ব আমরা কায়েম করে দেব। আন্দোলনের এই যে প্রকৃতি, এটাকেই আমি বলতে চেয়েছি, বুর্জোয়াদের অনুরূপ বুর্জোয়া ফর্ম অব অ্যাজিটেশনাল মুভমেন্ট (বুর্জোয়া কায়দায় বিক্ষোভ আন্দোলন)।

স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় বুর্জোয়ারা ব্রিটিশবিরোধী জনতার আন্দোলনের প্রবণতাকে অসংগঠিত অবস্থায় রেখে বিচ্ছিন্নভাবে জনতাকে দিয়ে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে লড়িয়েছে এবং তার চাপে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে বারগেইন (দর কষাকষি) করতে চেয়েছে। আজকেও বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, যারা জনতার মধ্যে অসন্তোষ এবং বিক্ষোভকে শুধু উস্কানি দেয় এবং তাকে ভিত্তি করেই লড়াইয়ের ময়দানে জনতাকে নামিয়ে দেয়, আর তার ফলে পুলিশের অত্যাচারে, শাসনযন্ত্রের দমনপীড়নে স্বাভাবিকভাবেই সরকারবিরোধী, শাসকদলবিরোধী যে মনোভাব এবং ঘৃণা জনতার মধ্যে বিস্তার লাভ করে, তাকেই তারা মনে করে একটা পলিটিক্যাল গেইন (রাজনৈতিক লাভ)। এর দ্বারা বিপ্লব হোক বা না হোক, জনসাধারণের দুর্দশার জন্য দায়ী এই সমাজব্যবস্থার কোনও একটা আমূল পরিবর্তন হোক বা না-হোক, তাতে তাদের কিছু আসে যায় না। কিন্তু এর দ্বারা সরকার বা শাসকদলবিরোধী যে বিক্ষুব্ধ মনোভাব এবং ঘৃণা জনসাধারণের মধ্যে আরও তীব্র হয়ে দেখা দেয়, তাকে ভিত্তি করেই এই সমস্ত দলগুলি কেউ বিপ্লবের কথা, সমাজতন্ত্রের কথা, কেউ জনসাধারণের জন্য কী করবে তার লম্বা ফিরিস্তি এবং জনসাধারণকে উজির-নাজির বানিয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি প্রভৃতি বড় বড় প্রতিজ্ঞা, ভাষণ, কর্মসূচি, এই সমস্ত দাখিল করে শেষ পর্যন্ত নির্বাচনের দিকে যায় এবং সরকার গঠনের চেষ্টা করে। আমি বলি, এই যে ভিসাস সার্কল (দুষ্ট চক্র), অর্থাৎ এই যে লড়াই বার বার দানা বাঁধছে, বিক্ষোভে মানুষ ফেটে পড়ছে, আর যারা নির্বাচনী পার্টি তারা সেই বিক্ষোভ থেকে মওকা নিয়ে ইলেকশন রাজনীতিতে ফয়দা তুলছে — সেই দুষ্ট চক্র থেকে গণআন্দোলন, বামপন্থী আন্দোলন এবং জনগণের বিপ্লবী আন্দোলনের বেরিয়ে আসার পথ কী?

গণআন্দোলনগুলোর সামনে সুস্পষ্ট রাজনৈতিক লক্ষ্য থাকা প্রয়োজন

আপনারা একটা কথা মনে রাখবেন, বিক্ষোভ যত বড়ই হোক, বিক্ষোভ আর বিপ্লব এক নয়। বিক্ষোভের দ্বারা আপনাআপনি বিপ্লব হয়ে যায় না। বিপ্লব মানে বর্তমান রাষ্ট্রব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন, অর্থাৎ বর্তমান রাষ্ট্রব্যবস্থাকে ভেঙে ফেলে তার জায়গায় একটি নতুন রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা, যাকে আমরা বলি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা। বর্তমান পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক-সামাজিক-রাজনৈতিক কাঠামোটির ধাঁচাটিকে সম্পূর্ণ পাল্টে ফেলে তার জায়গায় সমাজতান্ত্রিক ধাঁচা প্রবর্তন। তাকে আমরা বলি বিপ্লব। এই বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন বিক্ষোভের মধ্য দিয়ে আপনাআপনি জন্ম নেয় না, ইতিহাস একথা বলে না, বিজ্ঞান একথা বলে না, এ ধারণা অনৈতিহাসিক ও অবৈজ্ঞানিক। এইভাবে যারা বিক্ষোভকে বিপ্লবের সঙ্গে মিলিয়ে দেখে তারা হয় মূর্খ, আর নাহয় অত্যন্ত ধূর্ত, জাঁহাবাজ ইলেকশন রাজনীতিবিদ। তারা বিক্ষোভ আন্দোলনগুলিকেই, অর্থনৈতিক আন্দোলনগুলিকেই একটু মারমুখী ঢং-এ পরিচালনা করে সেগুলিকেই 'বিপ্লব' 'বিপ্লব' বলে চালিয়ে আসল বিপ্লবী আন্দোলনের প্রস্তুতিকে বিপথগামী করে দেয় এবং এইভাবে বিপ্লবটাকে গড়তে দেয় না। বিপ্লবের পথে তারা এসে বাধা সৃষ্টি করে। তাই বিক্ষোভ আর বিপ্লব এক নয় — একথা মনে রাখবেন। বিক্ষোভ এই পশ্চিমবাংলাতেই আজ না হলেও, আবার হবে, যেমন অতীতে হয়েছে। মানুষ বিক্ষোভে ফেটে পড়বে। কিন্তু, বিক্ষোভে ফেটে পড়ে, মার খেয়ে, সরকারবিরোধী হয়ে তারা আবার ইলেকশন রাজনীতির মধ্যে যাবে। পুঁজিবাদ যে জায়গায় ছিল, শোষণ যে জায়গায় ছিল, বেকার সমস্যা যে জায়গায় ছিল, শিক্ষার মান যেভাবে নিম্নগামী হচ্ছিল, নৈতিক মান যেভাবে দিনের পর দিন নিচের দিকে নেমে যাচ্ছিল — এগুলো সবই থাকবে। এর কেশাগ্রও আপনারা স্পর্শ করতে পারবেন না। হাজার কোরবানি হলেও শুধুমাত্র বিক্ষোভের দ্বারা, কোরবানির দ্বারা, আত্মত্যাগের দ্বারাই আপনারা বিপ্লব সংগঠিত করতে পারবেন না। এই বিপ্লব সংগঠিত করতে হলে আপনাদের নির্দিষ্ট স্পষ্ট রাজনৈতিক লক্ষ্য নিয়ে সংগঠিত হতে হবে — অর্থাৎ রাজনৈতিকভাবে সচেতন সংঘবদ্ধ জনতার দীর্ঘস্থায়ী লড়াই পরিচালনার সংগঠন গড়ে তুলতে হবে।

তাহলে, এই লড়াইগুলোর সামনে যে বিষয়টা প্রথমেই ঠিক হওয়া দরকার, তা হচ্ছে, আমরা কীসের জন্য লড়ব এবং কার বিরুদ্ধে লড়ব? ভারতবর্ষে বিপ্লবের কথা, লড়াইয়ের কথা, জান দেওয়ার কথা, সংগঠন করার কথা — এত যে কথা আমরা বলছি, সেই সংগঠনই বলুন, লড়াই করা বলুন এইসব কীসের জন্য? এগুলোর পরিষ্কার উত্তর আপনাদের পেতে হবে। আমার প্রশ্ন হচ্ছে, কংগ্রেসের বিরুদ্ধে আমরা লড়ছি কেন? কংগ্রেসের সঙ্গে কী আমাদের ব্যক্তিগত শত্রুতা আছে? না। আমি মনে করি, আমরা অন্তত তার জন্য লড়ছি না। তাহলে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে কি আমরা এই কারণেই লড়ছি যে, কংগ্রেস করে খাচ্ছে, আমরা করে খাওয়ার সুযোগ পাচ্ছি না? না। আমরা মনে করি, তার জন্য কংগ্রেস বিরোধিতার কোনও নৈতিক অধিকার আমাদের নেই। তাহলে আমরা কংগ্রেস বিরোধী কেন? আমরা কংগ্রেস বিরোধী এইজন্য যে, কংগ্রেস বর্তমান পুঁজিবাদী শাসনব্যবস্থাকে ছলে-বলে-কৌশলে, ধূর্ততার সঙ্গে, নানা যুক্তিজাল বিস্তার করে টিকিয়ে রাখবার জন্য চেষ্টা করছে। কংগ্রেস পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থা এবং রাষ্ট্রব্যবস্থাকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্য, টিকিয়ে রাখবার জন্য পুঁজিপতিশ্রেণীর, বুর্জোয়াশ্রেণীর রাজনৈতিক দল। আর, আমরা পুঁজিবাদকে উচ্ছেদ করতে চাই বলেই কংগ্রেসের বিরুদ্ধে রাজনৈতিকভাবে লড়াই করা আমাদের অবশ্যকরণীয় কাজ।

তাই যাঁরা আজ পুঁজিবাদবিরোধী নন, অথবা যাঁদের পুঁজিবাদবিরোধী বিপ্লবের কোনও কার্যক্রম বর্তমানে নেই, তাঁরা মার্কসবাদ-লেনিনবাদের কথা বললেও তাঁদের কংগ্রেস বিরোধিতা আর জনসংঘের কংগ্রেস বিরোধিতা, এস এস পি'র কংগ্রেস বিরোধিতা, সংগঠন কংগ্রেসের কংগ্রেস বিরোধিতা, স্বতন্ত্রের কংগ্রেস বিরোধিতা, প্রগতির কংগ্রেস বিরোধিতার মধ্যে আমি তো কোনও পার্থক্য দেখতে পাই না। যদি তাঁরা কংগ্রেস বিরোধিতা এই কারণে না করেন যে, তাঁরা পুঁজিবাদের বিরোধিতা করছেন, পুঁজিবাদকে তাঁরা উৎখাত করতে চান, আর কংগ্রেস পুঁজিবাদকেই টিকিয়ে রাখতে চেষ্টা করছে তাই তাঁরা কংগ্রেস বিরোধী — অর্থাৎ তাঁরা যদি পুঁজিবাদবিরোধী বিপ্লবের কথা না বলেন — তাহলে তাঁদের কংগ্রেস বিরোধিতা আর প্রগতির কংগ্রেস বিরোধিতার মধ্যে পার্থক্য কী? আমি অন্তত বুঝতে পারি না, আপনারা ভেবে দেখবেন। আমরা কংগ্রেসবিরোধী এইজন্য যে, কংগ্রেস পুঁজিবাদের রক্ষক। নাহলে কংগ্রেস খারাপ, আমরা ভাল — আমি মনে করি, এসব কথার কোনও মানে নেই। এখানে কোনও একটা লোক ভাল কি মন্দ, এ প্রশ্নটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হলেও, এর চাইতেও গুরুত্বপূর্ণ এবং বিচার্য বিষয় হচ্ছে, একটা ব্যবস্থা, একটা সিস্টেম, একটা রাষ্ট্রব্যবস্থা,

একটা অর্থনৈতিক ব্যবস্থা — অর্থাৎ ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা পুঁজিবাদী ব্যবস্থা কিনা এবং ভারতবর্ষের রাষ্ট্র সর্বতোভাবে ভারতীয় পুঁজিবাদকে সংহত এবং শক্তিশালী করার জন্য চেষ্টা করছে কিনা। এটাই হচ্ছে মূল প্রশ্ন।

ভারতবর্ষের বর্তমান রাষ্ট্রব্যবস্থা এদেশে পুঁজিবাদকেই সংহত হতে সাহায্য করছে

এখন একটা দেশের রাষ্ট্র পুঁজিবাদী রাষ্ট্র কিনা, তা কী দিয়ে আমরা বিচার করি? মার্কসবাদ-লেনিনবাদ আমাদের শিখিয়েছে, ইতিহাস এবং বিজ্ঞান থেকে আমরা শিখেছি যে, রাষ্ট্র পুঁজিবাদের বিকাশের জন্য তদানীন্তন পরিস্থিতিতে, অর্থাৎ যে সময়ে একটি রাষ্ট্র অবস্থান করছে সেই সময়ে পুঁজিবাদকে সংহত করার জন্য যা যা করা দরকার যদি তা করে, তাহলেই তাকে পুঁজিবাদী রাষ্ট্র বলে। আমি মার্কসবাদ-লেনিনবাদ থেকে আমার ক্ষুদ্র বিদ্যা-বুদ্ধিতে যতটুকু শিখেছি, যতটুকু বুঝেছি তা হচ্ছে এই। এঙ্গেলস থেকে শুরু করে লেনিন, স্ট্যালিন, মাও সে-তুং পর্যন্ত কারোরই এই জায়গায় ভুল হয়নি যে, সমস্ত আধুনিক রাষ্ট্রযন্ত্রই হচ্ছে পুঁজিবাদী রাষ্ট্রযন্ত্র এবং বর্তমান সাম্রাজ্যবাদ ও সর্বহারা বিপ্লবের যুগে, অর্থাৎ আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়াশীল পুঁজিবাদের এই স্তরে, পিছিয়ে-পড়া দেশগুলোতে, যেখানে পুঁজিবাদের অনেক জটিলতা, অনেক রকম আপস, অনেক রকম দুর্বলতা, সেখানে এই দুর্বলতাগুলি দিয়ে একটা রাষ্ট্র পুঁজিবাদী রাষ্ট্র, কি পুঁজিবাদী রাষ্ট্র নয়, তা নির্ধারিত হয় না। একটা রাষ্ট্র পুঁজিপতিশ্রেণীর দ্বারা পরিচালিত রাষ্ট্র কিনা তা নির্ধারিত হয়, তদানীন্তন পরিস্থিতিতে সেই বিশেষ রাষ্ট্রব্যবস্থাটি পুঁজিবাদকে টিকিয়ে রাখবার জন্য, পুঁজিবাদকে সংহত ও শক্তিশালী করবার জন্য, পুঁজিবাদকে তার সংকট থেকে বাঁচাবার জন্য যা যা করা দরকার সেই কাজগুলো করছে কি না তার উপর। ফলে, ভারতবর্ষের রাষ্ট্রব্যবস্থা আজকের আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি, আজকের জাতীয় পরিস্থিতি, আজকের বিশ্ব-পুঁজিবাদী বাজারের সংকট — এইরকম অবস্থার মধ্যে যদি পুঁজিবাদকেই সংহত হতে সাহায্য করে থাকে, তাহলে একথা মানতেই হবে যে, এই পুঁজিবাদের যে যে দুর্বলতাই থাকুক না কেন, এ পুঁজিবাদী রাষ্ট্র এবং বুর্জোয়াশ্রেণী এর কর্তৃত্বে রয়েছে। যথার্থই মার্কসবাদ-লেনিনবাদ মানলে এ সত্যকে অস্বীকার করার উপায় নেই। অন্য কোনও যুক্তিজালের আড়ালে, অন্য কোনও প্রিটেক্সট-এ (ছলে) এই সত্যকে অস্বীকার করার অর্থই হল পুঁজিবাদের বিরুদ্ধেই লড়াই করতে অস্বীকার করা। না হলে সাধারণভাবে পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে তো কংগ্রেসও কথা বলে। একচেটে পুঁজির শোষণের বিরুদ্ধে, কায়েমী স্বার্থের বিরুদ্ধে, জমিদারতন্ত্রের বিরুদ্ধে তারাও কথা বলে। এমন কী ছাত্র পরিষদ, যুব-কংগ্রেস এবং ইন্দিরাজি স্বয়ং সমাজতন্ত্রের কথাও বলছেন। তাঁরা ভুলেও বলেন না যে, তাঁরা পুঁজিবাদকে টিকিয়ে রাখতে চান, সংহত করতে চান। এই পুঁজিবাদকে টিকিয়ে রাখার কথা মুখে কেউ বলে না। কাজেই এটা বড় কথা নয় যে, কেউ পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে, বুর্জোয়ার বিরুদ্ধে, একচেটে পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে বলে কিনা। আসল কথা বলতে হবে, ভারতবর্ষের রাষ্ট্রটি পুঁজিবাদী রাষ্ট্র কিনা এবং তা পুঁজিবাদকে সংহত করছে কিনা। যদি করে থাকে, তাহলে বিপ্লব বলতে যদি কিছু বোঝায়, তাহলে এই পুঁজিবাদী রাষ্ট্রকে উচ্ছেদ করার বিপ্লবের কার্যক্রমের দ্বারাই তো একমাত্র তার মানে দাঁড়ায়। কিন্তু আমাদের দেশে বহু মার্কসবাদী-লেনিনবাদী এই বিষয়টি গোলমাল করছেন।

মার্কসবাদ-লেনিনবাদই আজকের যুগে একমাত্র মুক্তির পথ দেখাতে পারে

প্রসঙ্গক্রমে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা কথা এখানে বলে যেতে চাই। আপনাদের মনে রাখা দরকার যে, মার্কসবাদী-লেনিনবাদী বিপ্লবী তত্ত্ব এবং আদর্শ হচ্ছে এ যুগে জনগণের একমাত্র মুক্তির পথপ্রদর্শক। মার্কসবাদ-লেনিনবাদ আয়ত্ত করতে না পারলে, মার্কসবাদ-লেনিনবাদের বিচার-বিশ্লেষণ পদ্ধতি প্রয়োগ করে সমাজের রোগ নির্ণয় করতে না পারলে এবং রাষ্ট্রব্যবস্থার চরিত্র সঠিকভাবে নির্ধারণ করতে না পারলে সমাজের সমস্যাগুলি সম্পর্কে সঠিক রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি, অর্থাৎ ঠিক ঠিক বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলা এবং সেই অনুযায়ী সঠিক রাজনৈতিক লাইন বা কর্মসূচি, যাকে আমরা বিপ্লবী কর্মসূচি বলি, তা গ্রহণ করা সম্ভব নয়। ইতিহাসের দিকে চেয়ে দেখুন। মার্কসবাদের বিরুদ্ধে গিয়ে অনেক বড় বড় কথা বলে, অনেক মনগড়া ফর্মুলার দ্বারা সমাজকে, দেশকে পুঁজিবাদের হাত থেকে মুক্ত করার চেষ্টা যারাই করেছে — যেমন ইংল্যান্ডে লেবার পার্টি করেছে, ফেবিয়ান সোস্যালিস্টরা করেছে, ইউরোপের বহু সোস্যালিস্ট নানান জায়গায় নানান পরিকল্পনা করেছে — তারা কেউই পুঁজিবাদের গায়ে আঁচড়টি পর্যন্ত লাগাতে পারেনি। বরং তাদের সকলেরই পরিণতি

এই হয়েছে যে, তারা সকলেই শেষ পর্যন্ত পুঁজিবাদকে সেবা করেছে, সাম্রাজ্যবাদের সেবক হয়েছে, সাম্রাজ্যবাদকেই পৃষ্ঠপোষকতা করেছে। মজুর আন্দোলন পরিচালনা করা, ধর্মঘট পরিচালনা করা এবং খুব জোর জোর ধর্মঘট করে দেশের অর্থনীতিকে অচল করে দেওয়া, এ সবগুলি যদি মহা বিপ্লবী আন্দোলন হয় বা বিপ্লবী চরিত্রের একমাত্র লক্ষণ হয়, তাহলে এই সেদিনও লেবার পার্টি মহা বিপ্লব(!) করে ইংল্যান্ডের একেবারে ইলেকশন পর্যন্ত সংগঠিত করে দিল। কী হল তাতে? এগুলোর দ্বারা কি প্রমাণ হয় যে, এরা সমাজের বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন আনতে পারে? না। মার্কসবাদের বিরুদ্ধে গিয়ে আজকের যুগে সমাজের বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন কেউই আনতে পারে না। কারণ, মার্কসবাদই আজকের যুগে একমাত্র মুক্তির পথ দেখাতে পারে। অন্য সব মতবাদ বিভ্রান্তির মতবাদ। তাই যুব-সম্প্রদায় এবং জনসাধারণের যে অংশ আমাদের দেশে মার্কসবাদী আন্দোলনের বিকৃতি দেখে তারই প্রতিক্রিয়া হিসাবে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ থেকে মুখ ফিরিয়ে কংগ্রেসের দিকে ঝুঁকছেন, তাঁরা ভ্রান্ত। আমি তাদের এই কথাটা ভেবে দেখতে বলছি যে, মার্কসবাদের বিকৃতির জন্য মার্কসবাদ-লেনিনবাদ দায়ী নয়, দায়ী হচ্ছে তারাই যারা মার্কসবাদ-লেনিনবাদের নামে এদেশে মার্কসবাদকে বিকৃত করছে। এই অবস্থায় মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে বিকৃতির হাত থেকে মুক্ত করাই হচ্ছে তাঁদের কাজ। আমার এই কথাটা তাঁরা ভেবে দেখবেন।

মিথ্যার আশ্রয়ে বুর্জোয়াসমাজ টিকে থাকার চেষ্টা করছে

আমাদের সমাজে সমস্ত দিক থেকে সংকট আজ যে ভয়াবহ রূপ নিয়ে দেখা দিয়েছে তার কাহিনী ইনিয়ে বিনিয়ে আপনাদের সামনে আমি বলতে চাই না। কারণ, আপনারা নিজেরাই তার ভুক্তভোগী। জিনিসপত্রের দাম কী হারে বেড়েছে, এ আমাদের চেয়েও আপনারা ভাল করেই জানেন। যে কথাটা আমি শুধু বলতে চাই, তা হচ্ছে মিথ্যা যুক্তিজাল বিস্তার করে আমাদের দেশে বুর্জোয়া সমাজব্যবস্থা আজও টিকে থাকবার চেষ্টা করছে। বুর্জোয়া শাসকগোষ্ঠী দেশের জনগণকে ধাপ্পা দিচ্ছে, যুবকদের বিভ্রান্ত করছে এবং বুদ্ধিজীবীদেরও একটা অংশকে কিছু কিছু বিভ্রান্ত করছে, যদিও মোহমুক্তি তাদের দ্রুত ঘটছে। বুর্জোয়া শাসকদের সেই সমস্ত মিথ্যা কথা, মিথ্যা রাজনৈতিক চালাকিটুকু আপনাদের ধরা দরকার এবং তার হাত থেকে মুক্ত হওয়া দরকার। যেমন একটা সাধারণ কথা — ভারতবর্ষে জিনিষপত্রের দাম বাড়ছে। এটাকে আর চেপে রাখার কোনও উপায় নেই। এখানে জিনিসপত্রের দাম এমন হারে বেড়েছে যে, সেটা একটা অবিশ্বাস্য ব্যাপার। দুনিয়াজোড়া সমস্ত পুঁজিবাদী দেশেই একটা অর্থনৈতিক সংকট চলছে। রিশেসন (মন্দা) চলছে, তার একটা ধমকি চলছে। তার ফলে সমস্ত পুঁজিবাদী দেশেই কিছু কিছু জিনিসপত্রের দাম বেড়েছে। কিন্তু, ভারতবর্ষে যে হারে বেড়েছে, মাত্র এক বছরের মধ্যেই নানান জিনিসপত্রের দাম যা বেড়েছে, তার সঙ্গে দুনিয়ার কোনও দেশের তুলনা হয় না। কিন্তু সাধারণ মানুষ এত খবর রাখে না। ফলে, আপনারা দেখেছেন যে ইন্দিরাজি পট করে বলে দিলেন, জিনিসপত্রের দাম বাড়া শুধু ভারতবর্ষের ব্যাপার নয়, এটা নাকি আজকে দুনিয়াজোড়া সকল দেশেরই ব্যাপার। একটা ডাহা মিথ্যা কথা। প্রথমত সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর এরকম পরিস্থিতি নয়। আমাদের দেশের পাশেই চীন রয়েছে, সেখানে এরকম ব্যাপার নয়। সেখানে ক্রমাগত জিনিসপত্রের দাম মানুষের ক্রয়ক্ষমতার বাইরে একেবারে আকাশচুম্বী হয়ে যাচ্ছে, এ পরিস্থিতি একেবারেই নয়। অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতেও নয়। দুনিয়ায় পুঁজিবাদী দেশগুলিতে একমাত্র খানিকটা জিনিসপত্রের দাম বাড়ছে। কিন্তু ইন্দিরাজি অত্যন্ত চালাকি করে ধূর্ততার সঙ্গে বলে দিলেন যে, আমাদের দেশে অন্যান্য জায়গার মতোই জিনিসপত্রের দাম বাড়ছে। যেন এটা শুধু ভারতবর্ষের ব্যাপার নয়, এমন একটা জিনিস যা মানুষের ক্ষমতার বাইরে এবং এ বিষয়ে মানুষের করার কিছু নেই। এটা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মতোই একটা জিনিস। এ ভদ্রমহিলাকে দেখছি, আর কিছু শিখুন আর নাই শিখুন, ধূর্তামি এবং চালাকিটি খুব ভাল শিখেছেন।

আমি আপনাদের কাছে জিজ্ঞেস করি, জিনিসপত্রের দাম বাড়া কি একটা সমস্যা নাকি? এতো মূর্খের কথা। যেমন, মানুষের প্রকৃত আয়, প্রতিটি মানুষের নিম্নতম আয় যদি প্রচুর থাকত, গ্রামের লোক থেকে আরম্ভ করে শহরের প্রতিটি কর্মক্ষম মানুষের যদি সাড়ে তিনশো, চারশো টাকা করে ন্যূনতম আয় থাকত, তাহলে জিনিসপত্রের দাম যা বেড়েছে, তা নিয়ে কি এত হাহাকার হত? দ্বিতীয়ত ইন্দিরাজি আর একটা কথাও এখানে চেপে যাচ্ছেন যে, ইংল্যান্ড আমেরিকায় মজুররা যা মাইনে পায় তার অনুপাতে সেখানে দাম কতটা বেড়েছে। আর আমাদের দেশের মানুষের যা আয়, সেই অনুপাতে দাম কী হারে বেড়েছে — এইটের ভিত্তিতেই তো

পরিস্থিতিটাকে বুঝতে হবে। তা যদি বিচার করা যায়, তাহলে দেখা যাবে, আমাদের দেশে মানুষের প্রকৃত আয় ক্রমাগত কমছে, জিনিসপত্রের দাম বাড়ছে। আর, তাদের আয় বাড়ছে তার সঙ্গে সঙ্গে কিছু কিছু জিনিসপত্রের দামও বাড়ছে এবং যতটা যতটা বাড়ছে তাতে তাদেরও অসুবিধা হচ্ছে। কিন্তু গ্যাপ-টা ভারতবর্ষের মতো এত বড় নয়। তাহলে এই যে মিথ্যা কথা, একটা যা হয় বলে দেওয়া, এগুলোকেই আমি বলছিলাম মানুষের অজ্ঞতার সুযোগে ধূর্তামির রাজনীতি। সত্যকে সরাসরি মোকাবিলা করবার সৎসাহসের অভাব। নাহলে এতটা অজ্ঞ তিনি নন যে, ভারতবর্ষের সঙ্গে অন্যান্য দেশের তুলনা করবার সময় জিনিসপত্রের দাম বাড়ার সঙ্গে মানুষের নিম্নতম আয়ের মাপকাঠিকেও যে ধরতে হয়, এটা তিনি জানেন না। এতটা অজ্ঞ অন্তত তিনি হলেও তার দলবলের সকলেই এতটা অজ্ঞ, এটা মনে করবার কোনও কারণ নেই। তাহলে আমাদের দেশে জিনিসের দাম যে হারে বেড়েছে, মানুষের প্রকৃত আয় তার তুলনায় প্রতিদিন কমে যাচ্ছে। যা আগে ছিল তার চেয়েও কমে যাচ্ছে। জিনিসপত্রের দাম যে অনুপাতে বেড়েছে সেই হিসাবে আগে কম টাকা মাইনে পেয়েও একটা মজুরের কেনবার যতটুকু শক্তি ছিল, আজ টাকার অঙ্কে খানিকটা বেশি মাইনে হওয়া সত্ত্বেও তার সত্যিকারের মজুরি ঘাটতি হওয়ার ফলে তার কেনবার শক্তি কমে গিয়েছে। এটাই হচ্ছে পরিস্থিতি। এই পরিস্থিতিকে কী করে অস্বীকার করা যাবে? এই পরিস্থিতিতেই আমাদের দেশে এহেন হারে মূল্যবৃদ্ধির প্রশ্নটিকে বিচার করতে হবে।

বিশ্বপুঁজিবাদের বর্তমান তৃতীয় ভয়াবহ বাজার সংকটের যুগের পরিপ্রেক্ষিতেই ভারতবর্ষের পুঁজিবাদকে বিচার করতে হবে

তাহলে দেখুন অবস্থাটা কী। ভারতবর্ষের অর্থনীতি এবং ভারতবর্ষের রাষ্ট্রব্যবস্থা এ দুটোকে যে কোনও দিক থেকেই আপনারা যদি বিচার করেন, কথার জালে আটকা না পড়ে সাধারণ বুদ্ধি দিয়েও যদি বিচার করেন, তাহলে বুঝতে পারবেন, ভারতবর্ষের রাষ্ট্রটি পুঁজিবাদী রাষ্ট্র। এই রাষ্ট্রটি পুঁজিবাদকে দেখভাল করছে, বর্তমান পরিস্থিতিতে যেমন করে করলে তাকে সংহত করা যায় সেইদিকে লক্ষ রেখে। এবং সেইদিকে লক্ষ রেখে তার সমস্ত আচার-আচরণ, নীতি-নিয়ম, সবকিছু নির্ধারিত হচ্ছে। যেমন ধরুন, ভারতবর্ষের কৃষি অর্থনীতিতে পুঁজিবাদী অর্থনীতির ব্যাপক অনুপ্রবেশ ঘটেছে। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীতে যখন পুঁজিবাদ প্রগতিশীল ছিল, যখন আন্তর্জাতিক বিপ্লবটা পুঁজিবাদী বিপ্লব ছিল, যখন পুঁজিবাদ একদিকে ধর্ম, আরেকদিকে সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আপসহীন সংগ্রাম করে এগোচ্ছিল, যখন ব্যক্তিগত মালিকানার ভিত্তিতে হলেও উৎপাদন পুঁজিবাদী সম্পর্কের ভিত্তিতেই একটা বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন আনছিল, সেই সময়ে কৃষিতে পুঁজিবাদ অনুপ্রবেশ করেছে মেশিন প্রচলনের মাধ্যমে কৃষিকে ব্যাপকভাবে যন্ত্রীকরণ করে। পুঁজিবাদ তখন কৃষিতে ব্যাপক যন্ত্রীকরণ ঘটিয়েছে — একদিকে কৃষি অর্থনীতিকে শিল্পবিকাশের পরিপূরক কাঁচামাল সরবরাহের ভিত্তি হিসাবে গড়ে তোলার জন্য, খাদ্য সমস্যার মীমাংসার জন্য; আর অন্যদিকে গ্রাম থেকে বেশিরভাগ লোককে সারপ্লাস (বাড়তি) করে দিয়ে শিল্পগুলোতে নিয়ে এসে কাজ করাবার জন্য। কারণ, পুঁজিবাদী ব্যবস্থাতেই তখন শিল্পের অবাধ বিকাশ ঘটছে, কল-কারখানা গড়ে উঠেছে। ফলে, এই অবস্থায় দেশের বেশিরভাগ মানুষ যদি জমিতে 'সার্ফডমে' (ভূমিদাস ব্যবস্থায়) আটকে থাকে, ছোট ছোট জমিতে আটকে থাকে, তাহলে শিল্পে কাজ করার জন্য লোক তারা পাবে কোথায়? তাই তারা মেশিন দিয়ে চাষবাস শুরু করার মধ্য দিয়ে দু'টি কাজ করেছে। একদিকে শিল্পের কাঁচামাল তৈরি করার জন্য শিল্পের পরিপূরক কৃষি অর্থনীতি গড়ে তুলেছে অপরদিকে গ্রামের বাড়তি লোকগুলোকে নিয়ে এসে শহরে কাজ দিয়েছে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে এই জন্যই পুঁজিবাদ কৃষিতে মেশিন নিয়ে ঢুকেছে।

আর এযুগে, অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদ ও সর্বহারা বিপ্লবের যুগে পুঁজিবাদ শুধু প্রতিক্রিয়াশীল হয়েছে তাই নয়, বর্তমান সময়ে সে তৃতীয় বিশ্বজোড়া তীব্র বাজার সংকটের সম্মুখীন, যে বাজার সংকটের তীব্রতা আগের চাইতেও ভয়াবহ। এর আগেও ১৯৩০ সালে রিসেশন (মন্দা) হয়েছে এবং তার ফলে পুঁজিবাদ তীব্র বাজার সংকটের মধ্যে পড়ে প্রথম মহাযুদ্ধের পর আবার দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত করেছে অর্থাৎ আর একটা বিশ্বযুদ্ধ ঘটিয়েছে। পুঁজিবাদের বাজার সংকটের ফলেই এটা ঘটেছে। কিন্তু এসব সত্ত্বেও বিশ্ব পুঁজিবাদী বাজারের তখনও একটা আপেক্ষিক স্থায়ীত্ব ছিল এবং পুঁজিবাদী অর্থনীতির একটা বিকাশ ঘটাবার অবসর তখনও ছিল। এবার পুঁজিবাদের তৃতীয় বিশ্বজোড়া বাজার সংকটের যুগে তাও চলে গিয়েছে। পুঁজিবাদের এখনকার সংকট হচ্ছে এবেলা-ওবেলার সংকট। এবেলা যদি তেজিভাব থাকে, তাহলে ওবেলা মন্দা। পুঁজিবাদী বাজারে আজ

এই কাণ্ড ঘটছে। কাজেই, পুঁজিবাদ সংকট জর্জরিত হওয়া সত্ত্বেও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত আন্তর্জাতিক পুঁজিবাদী বাজারের এই যে একটা আপেক্ষিক স্থায়িত্ব ছিল, বিভিন্ন কারণে সেটা নষ্ট হয়ে গিয়েছে। যেমন ধরুন, পুরনো বিশ্ব-জোড়া পুঁজিবাদী বাজার থেকে, সাম্রাজ্যবাদী বাজার থেকে আজ একটা বিরাট অংশ বিরাট জনসংখ্যা নিয়ে বেরিয়ে গেছে। চীনে বিপ্লব হওয়ার ফলে, পূর্ব ইউরোপীয় দেশগুলিতে জনগণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে, উত্তর কোরিয়া এবং উত্তর ভিয়েতনামের জনগণের রাষ্ট্র এবং সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে, পুঁজিবাদী বাজার থেকে বেরিয়ে গিয়ে বিশ্বপুঁজিবাদী বাজারের পাশাপাশি আজ একটা বিশ্বসমাজতান্ত্রিক বাজারের সৃষ্টি হয়েছে। এর ফলে একটা বিরাট 'ট্র্যাডিশনাল' বাজার পুঁজিবাদের হাতছাড়া হয়ে গিয়েছে। উপরন্তু, অধুনা স্বাধীনতাপ্রাপ্ত এশিয়া, আফ্রিকার নতুন নতুন জাতীয় রাষ্ট্রগুলিও এই অবশিষ্ট পুঁজিবাদী বাজারের মধ্যে নতুন প্রতিযোগী হিসাবে এসে দেখা দেওয়ার ফলে ইতিমধ্যেই সংকুচিত বিশ্বপুঁজিবাদী বাজার আরও সংকুচিত হয়েছে। কাজেই দুনিয়াজোড়া সমস্ত বাজারটা নিজেদের দখলে থাকা সত্ত্বেও যেখানে ধনী পুঁজিবাদী দেশগুলো বাজার সংকটের জন্য একে অপরের বিরুদ্ধে যুদ্ধবিগ্রহ করতে বাধ্য হয়েছিল, সেখানে বর্তমান অবস্থায় সেই পুরনো বাজার বিরাটভাবে সংকুচিত হয়ে যাওয়ার ফলে তাদের এই বাজার সংকট আরও তীব্র রূপ ধারণ করেছে।

আজ উন্নত অনুন্নত সমস্ত পুঁজিবাদী দেশই শিল্পে সামরিকীকরণের পথে বেঁচে থাকার চেষ্টা করছে

অন্যদিকে তারা তাদের উৎপাদিকা শক্তির বিকাশকে আটকে রাখতে চাইলেও খানিকটা তার বৃদ্ধি ঘটছেই, যেটা কোনও পুঁজিবাদী দেশই, যত চেষ্টা করুক ধরে রাখবার, ধরে রাখতে পারে না। পুঁজিবাদী দেশগুলো টেকনোলজির বিকাশকে খানিকটা রোখবার চেষ্টা করতে পারে ষড়যন্ত্র করে, কিন্তু সম্পূর্ণভাবে তাকে রোখা যায় না। সেটা এই কারণেই রোখা যায় না যে, সেটা 'স্টিপুলেটেড' বা নির্ধারিত হচ্ছে প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের দ্বন্দ্ব এবং সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে। মানুষের বুদ্ধি এবং মননশীলতার সঙ্গে প্রকৃতির যে দ্বন্দ্ব এবং সংঘর্ষ তার উপরে মানুষের হাত নেই। তার থেকে যতই আটকে রাখার চেষ্টা হোক না কেন, বিজ্ঞানের খানিকটা অগ্রগতি পুঁজিবাদী সংকটের মধ্যেও ঘটবেই। ফলে, পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় যত চেষ্টা করাই হোক না কেন উৎপাদন ক্ষমতা কমাবার, উৎপাদনের ক্ষমতা বাড়ছেই। এই যে বাড়তি উৎপাদন ক্ষমতা, তাকে পুঁজিপতিরা কাজে লাগাবে কী করে? তাদের বাজার কোথায়? আর, বাজার ছাড়া পুঁজিপতিদের মাল তৈরি করলে মাল বিক্রি হবে না। মাল জমে যাবে। মাল জমে গেলে কী হবে? যতটুকু কলকারখানা চলছে, মানুষকে চাকরি দিয়ে বেকার সমস্যা যা আছে, সেগুলোর মধ্যেও ধাক্কা আসবে। কলে-কারখানায় লক-আউট ঘোষণা করতে হবে। আর, যদি লক-আউট নাও করে, অন্তত লে-অফ করবে, মজুর ছাঁটাই করবে, শিফ্‌ট্ বন্ধ করবে। ফলে, বহু মজুরের কাজ যাবে। স্বভাবতই কী হচ্ছে? এই বাজার সংকটের সামনে পড়ে উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলো, এমনকী আজকে পিছিয়ে পড়া দেশগুলো পর্যন্ত, যেখানে পুঁজিবাদী কায়দায় দেশকে পুনর্গঠনের চেষ্টা হচ্ছে সেখানে, পুঁজিপতিরা এই বাজার সংকটের সামনে পড়ে গোটা অর্থনীতিকে সামরিক অর্থনীতির সঙ্গে জড়িয়ে দিচ্ছে। অর্থাৎ, সংকটের ফলে যেখানে বাজারে ক্রমাগত তেজিভাব বজায় রাখা যাচ্ছে না, সেখানে কৃত্রিমভাবে বাজারে তেজিভাব বজায় রাখার চেষ্টা হচ্ছে। এর মানে হচ্ছে, জনগণের টাকায় সরকারের যে বাজেট তৈরি হয়, সেই বাজেটের টাকায় সরকার নিজেই বাজারে ক্রেতা হিসাবে উপস্থিত হয়। কিন্তু, কী কিনবে সরকার? তার কী কাজে লাগতে পারে? কাজেই তারা মিলিটারির শক্তিবৃদ্ধি করে এবং যুদ্ধবিগ্রহ লাগিয়ে দেয় নানা জায়গায়। তারা সমরাস্ত্র তৈরি করতে থাকে, সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করতে থাকে এবং প্রতিরক্ষা শিল্প গড়ে তুলতে থাকে। এই যে সামরিকীকরণের সঙ্গে অর্থনীতিকে একেবারে জড়িয়ে দেওয়া, সামরিক উৎপাদনের সঙ্গে উৎপাদন ব্যবস্থাকে একদম জড়িয়ে দেওয়া, তাকেই আমরা বলি মিলিটারাইজেশন অব ইন্ডাস্ট্রি (শিল্পের সামরিকীকরণ)।

এইগুলো সমস্ত পুঁজিবাদী দেশেই ঘটছে। ঘটছে এই কারণে যে, এই সংকট থেকে পুঁজিবাদকে খানিকটা বাঁচিয়ে রাখবার এছাড়া আর কোনও উপায় পুঁজিপতিদের সামনে নেই। তাই সমস্ত অগ্রসর পুঁজিবাদী দেশগুলিই দুনিয়াজোড়া যুদ্ধবিগ্রহ এবং স্থানীয় ক্ষেত্রে যুদ্ধ-সংঘর্ষগুলিকে উস্কানি দিচ্ছে। কোথাও এর সঙ্গে তাকে, কোথাও তার সঙ্গে ওকে লড়ালড়ি করিয়ে দিয়ে কিছু জমে যাওয়া মাল খালাস করছে। এক পক্ষকেও যেমন কিছু কামান বন্দুক দিচ্ছে, অপর পক্ষকেও কিছু অস্ত্রশস্ত্র দিচ্ছে। এ না দিয়ে তারা পারে না। তারা যখন শান্তির কথা বলে, তখনও তারা এই পথেই অগ্রসর হয়। কারণ, এইভাবে তাদের গুদামজাত অস্ত্রশস্ত্র খালাস

হতে থাকলে তবে শিল্পের যে সামরিকীকরণ তারা করছে, সেটাও খানিকটা বজায় রাখা তাদের পক্ষে সম্ভব হবে। তা না হলে, যদি এই সামরিক অস্ত্রশস্ত্র আবার তাদের ডাম্প (জমা) হতে থাকে, অর্থাৎ তাকেও খালাস করার একটা বাজার যদি তারা না পায়, তাহলে শিল্পের সামরিকীকরণ করেও বাজারে কৃত্রিম তেজিভাব বজায় রাখা তাদের পক্ষে সম্ভব হবে না। ফলে আবার স্ট্যাগনেশন (অচলাবস্থা) আসবে, আবার রিসেশন আসবে, আবার বেকার সমস্যার একটা বিরাট ধমকি এসে যাবে। এইভাবে পুঁজিবাদ আজ একটা ভিসাস সার্কল-এর মধ্যে পড়েছে। এরকম অবস্থায়, অর্থাৎ আন্তর্জাতিক পুঁজিবাদের যখন এইরকম অবস্থা তখন, এ যুগে পিছিয়ে-পড়া পুঁজিবাদী দেশগুলো আর অষ্টাদশ শতাব্দীর মতো মেশিন নিয়ে চাষবাসে নামতে পারে না। তাই বুর্জোয়ারা, পুঁজিপতিরা কী করছে এ যুগে? তারা গ্রামের মধ্যেই বেশিরভাগ মানুষকে আটকে রাখতে চাইছে। আপনারা লক্ষ করে দেখবেন, আমাদের দেশের বুর্জোয়া শাসকগোষ্ঠীও এই একই চক্রান্ত করে চলেছে।

আমাদের দেশের কৃষি অর্থনীতিতে পুঁজিবাদের চূড়ান্ত অনুপ্রবেশ ঘটেছে

আমাদের দেশের পুঁজিবাদী অর্থনীতি সামন্তী সম্পর্ককে ভেঙে গ্রামের মধ্যে ঢুকে গেছে। এই যে পুঁজিবাদী অর্থনীতি গ্রামের মধ্যে ঢুকেছে, এ আমরা বুঝছি কী দিয়ে? অত্যন্ত সহজভাবে একটা কথা আপনারা বুঝুন। আজ আমাদের দেশের গ্রামের উৎপাদন কারা কন্ট্রোল করছে? গ্রামের যে উৎপাদন, জমির যে উৎপাদন সেই উৎপাদন আজ স্টক এক্সচেঞ্জ, শেয়ার মার্কেট — এরা কন্ট্রোল করে। বড় বড় ব্যবসাদার এবং ফিনানসিয়্যাল অলিগার্কি (লগ্নিকারী পুঁজিপতিরা) ব্যাঙ্কিং-এর মারফত গোটা বাজারকে নিয়ন্ত্রিত করার মধ্য দিয়ে কৃষি পণ্যকেও নিয়ন্ত্রিত করছে। গ্রামীণ অর্থনীতির উৎপাদন, যেগুলোকে আমরা বলি কৃষিজাত উৎপাদন, সেগুলো আজকে পুঁজিবাদী জাতীয় বাজারের পণ্যে পরিণত হয়েছে। কৃষিজাত পণ্য আজ আর স্থানীয় বাজারের পণ্য নয়। মানুষ ভোগ করার জন্য উৎপাদন করছে — উৎপাদনের মূল প্রকৃতিটা গ্রামে আর তা নেই। গ্রামে বেশিরভাগ জমি যাদের হাতে রয়েছে তারা, এমন কী একটু সম্পন্ন মধ্যচাষীও, জমিতে টাকা খাটাচ্ছে। তার থেকে যে ফসল হচ্ছে, সেই ফসলটা জাতীয় বাজারে বিক্রি করে আবার তাদের টাকাকে স্ফীত করছে। বাকিরা তো ভূমিহীন চাষী, বা এক বিঘা, দু'বিঘা জমির মালিক, যাদের পেটেরই সংস্থান হয় না। তাহলে এই যে পুঁজি থেকে পুঁজি বৃদ্ধি, এই যে জমি পুঁজি বিনিয়োগ করার ইনস্ট্রুমেন্টে (যন্ত্রে) রূপান্তরিত হওয়া, আর কৃষিজাত পণ্য পুঁজিবাদী জাতীয় বাজারের পণ্যে রূপান্তরিত হওয়া — একেই তো বলে কৃষি অর্থনীতিতে পুঁজিবাদ। মার্কসবাদ-লেনিনবাদ সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র কাণ্ডজ্ঞান থাকলে একথা তো কারোর অস্বীকার করার উপায় নেই এবং অনেকে একথা স্বীকারও করছেন। অনেক তথাকথিত মার্কসবাদী-লেনিনবাদীরাও তাঁদের প্রোগ্রামে একথা স্বীকার করছেন যে, আমাদের দেশের কৃষিতে পুঁজিবাদ চূড়ান্তভাবে অনুপ্রবেশ করেছে।

আমাদের দেশের এই পুঁজিবাদ পিছিয়ে-পড়া পুঁজিবাদ হলেও এ আজ চূড়ান্ত সংকটের সামনে পড়েছে। সে বেকার সমস্যার সমাধান করতে পারছে না, শিল্পে অনগ্রসর হওয়া সত্ত্বেও তার অর্থনীতিতে মন্দার চাপ রয়েছে, সংকটের চাপ রয়েছে, বাজার সংকট রয়েছে। কারণ, দেশের অভ্যন্তরে বাজার সম্প্রসারণ তেমনভাবে আর সে ঘটাতে পারছে না। পুঁজিবাদ ভারতবর্ষে কী অবস্থার সামনে পড়েছে, তা এই কথাগুলো বুঝলে আপনারা ভাল করে বুঝতে পারবেন। আপনারা জানেন, আমাদের দেশের তিপ্পান্ন-চুয়ান্ন কোটি লোকের মধ্যে শতকরা পঁচাত্তর থেকে আশিভাগ লোক আজও গ্রামে বাস করে। এই যারা গ্রামে বাস করে সেই গ্রামীণ সমস্ত জনসংখ্যার মধ্যে খুব রক্ষণশীল হিসাবেও শতকরা একান্ন থেকে তিপ্পান্ন ভাগ লোক হচ্ছে ভূমিহীন চাষী বা খেতমজুর। বাস্তব হিসাবে এই সংখ্যা প্রায় শতকরা ষাট ভাগ হবে। তবুও এদের সংখ্যা শতকরা তিপ্পান্ন ভাগই ধরুন। এই খেতমজুরদের মধ্যে কিছু লোক আছে, যাদের এক বিঘা থেকে দেড় বিঘা, দু'বিঘা জমি আছে। আবার বেশিরভাগের তাও নেই। আর, তিন থেকে পাঁচ বিঘা পর্যন্ত জমি রয়েছে, এরকম জমির মালিকের সংখ্যা গোটা ভারতবর্ষের হিসাব ধরলে ন্যূনতম পক্ষে শতকরা পনেরো ভাগের কম নয়। এই যে তিন থেকে পাঁচ বিঘা পর্যন্ত জমির মালিক, এদের জমি আনইকনমিক হোল্ডিং (অলাভজনক জোত) হওয়ার ফলে যদি সেচ এলাকার অন্তর্ভুক্তও হয়, তাহলেও সেই সেচ ব্যবস্থার পুরো সুযোগ এরা নিতে পারে না। ফলে, এই অল্প জমির মালিকদের আজকের দিনে জিনিসপত্রের চড়া দামের বাজারে পরিবারে ছয় থেকে সাতজন লোক নিয়ে — গ্রামে এর থেকে কম সদস্যের পরিবার কোথাও নেই — যা সামর্থ্য, তাতে তারা এই জমিতে ভাল করে চাষও করতে পারে না। আর, করলেও তার দ্বারা একটা পরিবারের কোনওমতেই দিনযাপন হয় না। তাহলে

শতকরা এই পনেরো ভাগ গ্রামীণ জনসংখ্যার সাথে ভূমিহীন চাষী ও খেতমজুরদের শতকরা তিপ্পান্ন ভাগ নিয়ে শতকরা আটষট্টি ভাগ গ্রামীণ জনসংখ্যা হচ্ছে সর্বহারা, একেবারে সর্বহারা — কিছুই যাদের নেই, কেনবার ক্ষমতা নেই, সারা বছর খাওয়ারই সংস্থান নেই। তিন বিঘা থেকে পাঁচ বিঘা জমির মালিক হলেও এরা ঘরবাড়ি ছেড়ে দিয়ে অন্য জায়গায় মাটি কাটে, ছইয়ালের কাজ করে, এখানে সেখানে নানান প্রক্রিয়ায় জীবনযাপন করে। কারণ, তাদের বাঁধাধরা কোনও কোজ নেই — খেতমজুরদেরও নেই, ভূমিহীন চাষীরও নেই, এই গরিব চাষী বলতে একেবারে যে নিম্নস্তরটা তাদেরও নেই। ফসল বোনার এবং ফসল কাটার সময়টুকু ছাড়া গ্রামের এই বিরাট জনসংখ্যাটা যে কী অদ্ভুত প্রক্রিয়ায় জীবনযাপন করে, সেটা গ্রামের কথা যাঁরা জানেন না, যাঁরা ঘরে বসে শুধু গ্রামের লোকের কথা ভাবেন, তাঁরা বুঝতেই পারবেন না। তাহলে গ্রামীণ জনসংখ্যার এই যে শতকরা আটষট্টি ভাগ এরা তো সর্বহারাই।

তারপর আসুন, যাদের পাঁচ বিঘে থেকে পনেরো বিঘে পর্যন্ত জমি রয়েছে গ্রামে, তেমন জমির মালিকের সংখ্যা যদি ধরা যায়, তাহলে তা হচ্ছে শতকরা পনেরো ভাগের কাছাকাছি, কিছু বেশি বা কম। এদের মধ্যে যাদের জমি সেচ এলাকার অন্তর্ভুক্ত, তাদের তবুও যা হোক করে গরিবানা মতে কোনওরকমে খেয়ে-পরে চলে। কিন্তু এদের মধ্যে যাদের জমি সেচ এলাকাভুক্ত নয়, তাদের তা দিয়েও চলে না। তাদের চাষবাস পড়ে থাকে, ফসল মার খায়। তাদেরও কেনবার ক্ষমতা নেই। এরা অর্ধসর্বহারা। তাহলে গ্রামীণ জনসংখ্যার আগের শতকরা আটষট্টি ভাগের সঙ্গে শতকরা এই পনেরো ভাগ যোগ দিলে গিয়ে দাঁড়ায় শতকরা তিরাশি ভাগ, যারা সর্বহারা এবং আধাসর্বহারা। আর এই পনেরো বিঘা থেকে ত্রিশ বিঘা, পঁয়তাল্লিশ বিঘা, ষাট বিঘা বা শিলিং-এর মধ্যে যাদের জমি রয়েছে — এই রকম কিছু মধ্যচাষী এবং সম্পন্ন মধ্যচাষীকে যদি বাদ দেন, তাহলে দেখা যাবে, খুব অল্পসংখ্যক লোকের হাতে জমি বেনাম করে বা নানান কারসাজি করে গ্রামে মোট জমির পরিমাণের শতকরা ষাট থেকে পঁয়ষট্টি ভাগ কুক্ষিগত হয়ে রয়েছে। এই যে অল্প লোকের হাতে প্রচুর পরিমাণে জমি কুক্ষিগত হয়েছে, এটা কোন প্রক্রিয়ায় ঘটেছে? পুঁজিবাদের প্রক্রিয়া ছাড়া এ জিনিস ঘটার আর কী যাদু আছে? অথচ মেশিন-ট্র্যাক্টর তা সত্ত্বেও গ্রামে আসছে না। অল্প লোকের হাতে বেশিরভাগ জমি কুক্ষিগত হওয়া সত্ত্বেও চাষবাসের ক্ষেত্রে মেশিন-ট্র্যাকটরের প্রয়োগ ঘটছে না। অনেকে বলছেন, সামন্তী মেজাজের জন্য নাকি এটা আসছে না। কী অদ্ভুত কথা দেখুন! মানুষের সামন্তী মেজাজ তো একটা কালচারের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। অর্থনীতিতে তার জন্য মেশিন-ট্র্যাক্টর আসতে অসুবিধা হবে কেন? বরং সামন্তী মেজাজ আজও যতটুকু আছে, মেশিন-ট্র্যাক্টর এলেই তো সেটা ভাঙবে। তাহলে গ্রামীণ অর্থনীতিতে মেশিন-ট্র্যাক্টর না আসার অন্য কারণ আছে। কারণ, পুঁজিবাদী রাষ্ট্র এবং পুঁজিবাদী শাসনব্যবস্থা ব্যাপকহারে এই মেশিন-ট্র্যাক্টর প্রর্বতনের বিরুদ্ধতা করছে। একমাত্র যেখানে পরীক্ষামূলকভাবে চালু করা দরকার, সেখানে কিছুটা করা ছাড়া ব্যাপকহারে মেশিন-ট্র্যাক্টরের প্রবর্তন করছে না।

সংকটগ্রস্ত পুঁজিবাদী অর্থনীতির জন্যই কৃষির যন্ত্রীকরণ হচ্ছে না

কংগ্রেসের নাগপুর অধিবেশনে শাস্ত্রীজি তো বলেই বসলেন যে, আমাদের কি এত বোকা পেয়েছ যে, মেশিন-ট্র্যাক্টর দিয়ে আমরা চাষবাস করব? এত বুদ্ধু আমরা নই। কারণ কী? কারণ, এমনিই গ্রামের লোক দলে দলে বেকার হয়ে শহরে আসছে। পুঁজিবাদের অনুপ্রবেশের ফলে গ্রামীণ অর্থনীতিতে জমি ছাড়া হয়ে যাদের সারা বছর কাজ থাকছে না, সেই মানুষগুলো দলে দলে শহরে আসছে কাজের সন্ধানে। অন্যদিকে শহরেও এমনিই বেকার বৃদ্ধি পাচ্ছে। ঘরে ঘরে বেকার বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে, গ্রাম থেকে লোক এসে সেই বেকারবাহিনীকে আরও বাড়াচ্ছে। এই অবস্থায় গ্রামের মানুষ টুকরো টুকরো এক বিঘা, দেড় বিঘা জমিতে যতটুকু আটকে আছে, তাতে জাতীয় অর্থনীতির অপচয় হলেও এবং মানুষগুলো অর্ধভুক্ত, অর্ধনগ্ন অবস্থায় অমানুষের মতো দিনযাপন করলেও শাসকশ্রেণী তাতেই গ্রামের মানুষকে আটকে রাখতে চাইছে। জমির মায়ায় গ্রামে অন্তত যারা আটকে রয়েছে, সেই লোকগুলোকে তারা জমি ছাড়া করতে চাইছে না। তাই দেখুন, মহা জমি-প্রেমিক হয়ে গেলেন শাস্ত্রীজি। এর অর্থ কী? কারণ, এই যে মানুষগুলো আজও গ্রামে জমিতে আটকে রয়েছে, সেখানে মেশিন-ট্র্যাক্টর দিয়ে জমি চাষ করতে গেলেই লক্ষ লক্ষ লোক গ্রামে এক ধাক্কায় বেকার হয়ে যাবে। সেই বেকারবাহিনীর চাপ কোনও পুঁজিবাদী রাষ্ট্র সামাল দিতে পারে না। তাই বেকারের চাপ থেকে সাধ্যমতো গ্রামীণ অর্থনীতি এবং পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে বাঁচাবার জন্য ভারতবর্ষের বুর্জোয়া শাসকগোষ্ঠীর ভূমি

সংস্কারের পরিকল্পনা হচ্ছে, খণ্ড খণ্ড জমিতে, পারলে সিলিং আরও কমিয়ে, পারবে কি পারবে না আলাদা কথা, কত বেশিরভাগ লোককে অর্ধভুক্ত এবং অর্ধনগ্ন অবস্থায় আটকে রাখা যায়।

কাজেই, যখন শুনি, আমাদের দেশের তথাকথিত মার্কসবাদী-লেনিনবাদীরাও বেকার বাড়বে বলে মেশিন-ট্র্যাক্টর চালু বন্ধ করার স্লোগান তুলছেন, তখন আমার সত্যই ভাবতে অবাক লাগে। তাদের অনেকের পার্টি প্রোগ্রামে দেখা যাচ্ছে যে, তারা চাষী আন্দোলনের কর্মসূচি হিসাবে মেশিন-ট্র্যাক্টর রোখবার কথা বলছেন এবং মেশিন-ট্র্যাক্টরের প্রচলন রোখার এই আন্দোলনকে সামন্ততন্ত্রবিরোধী বিপ্লবী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত করতে আহ্বান দিচ্ছেন। কী অদ্ভুত স্ববিরোধী কথা দেখুন! সামন্ততন্ত্র উচ্ছেদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে গিয়ে মেশিন-ট্র্যাক্টর বিরোধী আন্দোলনে যাবার প্রয়োজন কী? মেশিন-ট্র্যাক্টর চালু করলেই তো গ্রামীণ অর্থনীতিতে সামন্ততন্ত্র উচ্ছেদ হবে। তাই তো হয়। তাহলে মেশিন-ট্র্যাক্টর রোখার আন্দোলনকে সামন্ততন্ত্র উচ্ছেদের আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত করতে হবে এ কথা বলার মানে কী? সামন্ততন্ত্রের জন্য মেশিন-ট্র্যাক্টর প্রয়োগ করতে আটকাচ্ছে নাকি? এতো সেই পুঁজিবাদকে তার বেকার সমস্যার চাপ থেকে বাঁচাবার জন্য মেশিন-ট্র্যাক্টরকে রোখার বুর্জোয়া রাজনীতি বা বুর্জোয়াদের ভূমি সংস্কারের কর্মসূচিরই অনুরূপ কর্মসূচি। একথা ঠিক যে, গ্রামে চাষী আন্দোলন করতে গিয়ে যদি দেখা যায়, কোথাও মেশিন-ট্র্যাক্টর আসার ফলে চাষীরা বেকার হয়ে যাচ্ছে, তখন সেই অবস্থায় মেশিন-ট্র্যাক্টর প্রবর্তনের বিরুদ্ধে তাদের সংগঠিত করা দরকার হতে পারে। কিন্তু, সেই অবস্থাতেও তাদের সংগঠিত করে যখন আমরা আন্দোলনে নিয়ে আসব, তখনও তো এই কথাটাই আমাদের বোঝাতে হবে যে, জনসাধারণ নীতিগতভাবে মেশিন-ট্র্যাক্টর প্রবর্তনের বিরোধী নয়। চাষী মেশিন-ট্র্যাক্টর প্রবর্তনই চায়, তা না হলে গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নতি হবে কী করে? তাদের আর্থিক দুর্দশা ঘুচবে কী করে? বাজার সম্প্রসারণ ঘটবে কী করে? শিল্পবিপ্লবের দরজা খুলবে কী করে? শিল্পের জন্য কাঁচামাল উৎপাদন সম্ভব হবে কী করে? কাজেই মেশিন-ট্র্যাক্টরের প্রবর্তন দেশের প্রগতির জন্যই করা দরকার, চাষীর জীবনের দুর্দশা ঘোচাবার জন্যই দরকার। কিন্তু, আজকের দিনে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার মধ্যে, পুঁজিবাদী কাঠামোর মধ্যে এটা করার উপায় নেই — অর্থাৎ, পুঁজিবাদ না ভেঙে এটা করা যায় না। করতে গেলে চাষী বেকার হয়ে যাবে। তার খাওয়ার যতটুকু সংস্থান আছে, তাও থাকবে না। তাই চাষীকে পুঁজিবাদ উচ্ছেদের জন্য তৈরি হতে হবে এবং যতক্ষণ পুঁজিবাদকে তারা উচ্ছেদ করতে না পারছে, ততক্ষণ তারা স্লোগান তুলবে — হয় বিকল্প কাজ দিতে হবে, নাহলে মেশিন-ট্র্যাক্টর চালু করা যাবে না। চাষী তার উন্নতির জন্যই মেশিন-ট্র্যাক্টর চালু করতে চাইবে, আর এই চালু করার জন্য পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে সে উচ্ছেদ করবে। আর, এইসব তথাকথিত মার্কসবাদী-লেনিনবাদী দলগুলি মেশিন-ট্র্যাক্টরকে রোখবার জন্যই স্লোগান তুলছে। অদ্ভুত কথা!

সারা বছর সমস্ত কর্মক্ষম ব্যক্তির কাজ পাওয়ার সমস্যাই গ্রামীণ অর্থনীতির আসল সমস্যা

তাছাড়া সাধারণ অর্থনীতির ছাত্ররাও জানেন, একটা দেশের অর্থনীতি অগ্রসর, কি অনগ্রসর, তা কী দিয়ে বিচার হয়? বিচার হয়, সেই দেশের কত মানুষ গ্রামীণ অর্থনীতিতে চাষবাসে নিয়োজিত, আর কত মানুষ শিল্পে কলে-কারখানায় নিয়োজিত তার মাপকাঠিতে। এর দ্বারাই নির্ধারিত হয়, দেশটা অগ্রসর, অর্থাৎ দেশটা উন্নত দেশ, নাকি, দেশটা পিছিয়ে পড়া দেশ। তাহলে যাঁরা বলছেন, দেশকে উন্নত করতে হবে, শিল্পবিপ্লব গড়ে তুলতে হবে, তাঁরাই আবার ভূমিসংস্কারের এমন পরিকল্পনা দিচ্ছেন, যাতে বেশিরভাগ মানুষগুলোকে অর্ধভুক্ত, অর্ধনগ্ন অবস্থায় দু'বিঘা, তিন বিঘা জমির লোভ দেখিয়ে গ্রামেই আটকে রাখা যায়। আর একটা সাধারণ কথাও আপনারা বুঝে দেখুন। একথা ঠিক, যে মানুষগুলোর জমি নেই, তাঁদের যদি তিন বিঘা বা দু'বিঘা জমি দেওয়ার কথা বলা হয় তাঁরা সকলেই চাইবেন। কিন্তু তাঁরা যে তিন বিঘা বা দু'বিঘা জমি পরিবার পিছু পাবেন, তাঁরা কি সেটা রক্ষা করতে পারবেন? সেই জমিতে চাষবাস করে সংসার প্রতিপালন করতে পারবেন? তাঁরা তা পারবেন না। সেই অবস্থায় কী হবে? এই দু'বিঘা বা তিন বিঘা আনইকনমিক হোল্ডিং হওয়ার ফলে হয় সেই জমিগুলো পড়ে থাকবে, নাহয় তাঁরাই আবার সেই জমি বিক্রি করে দিয়ে পুনরায় ভূমিহীন চাষী হবেন। ফলে, দু'দিক থেকে ক্ষতি হবে। প্রথমত, ভূমিহীন চাষীরও লাভ হবে না। শুধু লোভে পড়ে তিনি নেবেন, কিন্তু পরিবার প্রতিপালন করতে পারবেন না। দ্বিতীয়ত, দেশের উৎপাদন মার খাবে। অথচ একদল তথাকথিত বামপন্থী রাজনীতিবিদ শুধু নিজেদের সংগঠন বাড়াবার জন্য এই মিথ্যা রাজনীতিটা দিয়ে চাষীকে আটকাবার চেষ্টা করছে। আমরা এই মিথ্যা রাজনীতির বিরুদ্ধে।

আপনারা মনে রাখবেন, ভূমিহীন চাষী, গরিব চাষী, খেতমজুরদের মধ্যে জমি বণ্টনের কর্মসূচির বিরোধী আমরা নই। কিন্তু আমরা মনে করি, ভারতবর্ষে যত জমি আছে — যত সিলিং করে হোক, বেনাম জমি উদ্ধার করে হোক, পতিত জমি চাষোপযোগী করে হোক — সারা ভারতবর্ষে যা জমির হিসাব, আর সারা ভারতবর্ষে গ্রামে যে ভূমিহীন চাষী, গরিব চাষী, খেতমজুর রয়েছে, তাদের সকলকে উপযুক্ত পরিমাণে জমি দেওয়া যাবে না। পরিবার পিছু যদি আজকের দিনে নয় বিঘা করেও জমি দেওয়া যায়, তাহলেও তা ইকনমিক হোল্ডিং হবে না। আমার মনে আছে, এখন থেকে কুড়ি পঁচিশ বছর আগে একবার সারা ভারত সম্মেলনে আমরা হিসাব করেছিলাম, একটা পরিবারের পক্ষে বারো বিঘা জমি হচ্ছে লাভজনক জোত। আর, আজকে জিনিসপত্রের দাম যা বেড়েছে, সেই হিসাব অনুযায়ী লাভজনক জোত হবে গিয়ে অন্তত পনেরো থেকে কুড়ি বিঘা। তা সে যদি বাদও দেওয়া যায়, দেশে যে পরিমাণ জমি আছে, তাতে সাত থেকে নয় বিঘা করে জমিও গ্রামের অর্ধেক মানুষকে দেওয়া যাবে না। তাহলে বাকি অর্ধেক মানুষ তো জমিই পাবে না। আবার, সাত থেকে নয় বিঘা করে জমি যে পরিবারগুলোকে দেওয়া হবে, যতই পরিবার পরিকল্পনা হোক সেই পরিবারগুলোতে অন্তত তিনটি সন্তান তো হবে। তাহলে পরবর্তী বংশধরদের ভাগে গিয়ে সেই জমি তিন বিঘা করে দাঁড়াবে। তাদের চলবে সেই জমি দিয়ে? তাহলে দেখা যাচ্ছে, ভূমিহীন চাষী, গরিব চাষী, খেতমজুরদের মধ্যে জমিবণ্টন চাষী আন্দোলনের একটা গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি হলেও, গ্রামীণ অর্থনীতিতে আসল সমস্যা হচ্ছে, যে বাড়তি জনসংখ্যা গ্রামে ক্রমাগত সৃষ্টি হচ্ছে, গ্রামীণ অর্থনীতির মূল সমস্যার সমাধান এর দ্বারা হতে পারে না। জমির উপরে যারা নির্ভর করতে পারে না, তাদের চাকরির সমস্যা, তাদের কাজ দেওয়ার সমস্যা। কিন্তু কোথায় তাদের কাজ দেওয়া হবে? কলে-কারখানায় তাদের কাজ দিতে হলে শিল্পবিপ্লবের দরজা খুলে দিতে হবে। এই শিল্পবিপ্লবের দরজা খুলে দেওয়া যাচ্ছে না কেন? এই শিল্পবিপ্লব কেন আটকাচ্ছে? কেন বার বার তা মুখ থুবড়ে পড়ছে? কারণ পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় উৎপাদন হয় লাভের দিকে লক্ষ রেখে।

আপনারা লক্ষ করলেই দেখবেন, স্টেটসম্যান কাগজে চিঠিপত্রও বেরোচ্ছে, বুর্জোয়া অর্থনীতির সব পণ্ডিতরা আলোচনা করছেন এবং খুব মাথা খাটিয়ে ফর্মুলা বার করছেন যে, শিল্পের পরিচালন ব্যবস্থা দক্ষ কিনা, তা ঠিক হবে লাভের দিকে লক্ষ রেখে। লাভ হচ্ছে কিনা, সেটা দেখাই হবে দক্ষ পরিচালন ব্যবস্থার কাজ। একটা খাঁটি কথা এবং সত্য কথাই। যত বুকনি করে অর্থনৈতিক তত্ত্ব দিয়েই তাঁরা বলুন, আসল কথাটাই বলে ফেলেছেন, তা হচ্ছে লাভ না হলে পুঁজিবাদী দেশে উৎপাদন হয় না, পুঁজিপতিরা উৎপাদন করে না, করতে পারে না। তাহলে পুঁজিপতিদের এই লাভটা আসবে কোত্থেকে? না, বাজারে বিক্রি করে। তা বাজার মানে কী? বাজার মানে হচ্ছে, মানুষের ক্রয়ক্ষমতা — অর্থাৎ পুঁজিপতিদের নির্ধারিত দাম দিয়ে সাধারণ মানুষের জিনিসপত্র কেনবার ক্ষমতা। তা আপনারা আগেই শুনলেন মজুরের ন্যায্য মজুরি কমেছে। টাকার অঙ্কে তার মাইনে কিছু বাড়লেও জিনিসপত্রের দামের অনুপাতে তার প্রকৃত আয় কমছে। অন্যদিকে শহরে ঘরে ঘরে বেকার এবং এই বেকারের সংখ্যা বাড়ছে দিনের পর দিন। তাদের কেনবারই ক্ষমতা নেই। গ্রামে শতকরা তিরাশি ভাগ লোক অর্ধভুক্ত, অর্ধনগ্ন। সারা দিন খাবার সংগ্রহ করতে, আর মা-বোনের লজ্জা নিবারণ করবার জন্য একটুরো 'কানি' সংগ্রহ করতেই তাদের জান কয়লা হয়ে যাচ্ছে। এই যেখানে তাদের অবস্থা, সে দেশের বাজার সম্প্রসারণ হবে কী করে? সে দেশের মানুষের ক্রয়ক্ষমতা বাড়বে কী করে? আর, এই অবস্থায় সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতা না বাড়লে পুঁজিপতিরা কী করে? তারা কম মাল তৈরি করে দাম বাড়িয়ে লাভটা তুলে নেয়। অন্যদিকে পুঁজিপতিদের বিদেশের বাজারেও খুব একটা সুবিধা হচ্ছে না। এইরকম একটা অবস্থায় গ্রামীণ অর্থনীতির যদি আধুনিকীকরণ করা না যায়, বৈজ্ঞানিকীকরণ না করা যায়, তাহলে গ্রামের মানুষের দুর্দশা ঘোচানো যাবে না। আর, গ্রামের মানুষের দুর্দশা না ঘোচালে বাজার সম্প্রসারণের রাস্তাও খোলা যাবে না। আবার কৃষির আধুনিকীকরণ করতে পারা যাবে না, তাতে হাত দেওয়া যাবে না, যদি শিল্পবিপ্লবের দরজা খুলে দেওয়া না যায়, যদি পুঁজিবাদী উৎপাদন-সম্পর্ক এবং পুঁজিবাদী রাষ্ট্রব্যবস্থা ভেঙে সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন-সম্পর্ক এবং উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে সমাজব্যবস্থা প্রবর্তন করতে না পারা যায়।

ভারতবর্ষের শিল্পপুঁজিই একচেটিয়া পুঁজিবাদে রূপান্তরিত হয়েছে

তাহলে এই হচ্ছে আমাদের দেশের অবস্থা। বিদেশের বাজার নেই। দেশের বাজারও নষ্ট হচ্ছে। বুর্জোয়া শাসকগোষ্ঠী বলছে, দেশে এই যে সংকট দেখা দিয়েছে, এটা নাকি সাময়িক। আমি ১৯৪৯ সাল থেকে চিৎকার

করছি এবং নানা লেখায় বলেছি যে, বুর্জোয়া শাসকরা যে সমস্ত প্ল্যানিং করছে, সেই সমস্ত পরিকল্পনাগুলো কিছু কিছু কার্যকর হচ্ছে ঠিকই, কিন্তু এই সমস্ত পরিকল্পনাগুলোকে একটা সংকটের ছায়া সব সময় অনুসরণ করছে। একটা সংকট থেকে তারা বেরিয়ে আসছে আরও একটা জটিল এবং গভীর সংকটে ঢোকবার জন্য। আজকেও অর্থনীতিতে যে মন্দার ধমকি আসছে, বুর্জোয়া শাসকরা তার থেকে বেরোবার নানা পরিকল্পনা করছে। আমি আবার বলছি, ওরা শুধু বেরোবে এর চেয়েও একটা বড় মন্দার মধ্যে পড়বার আয়োজন করবার জন্য। পুঁজিবাদের এর থেকে বেরোবার আজ আর রাস্তা নেই। আর, ভারতবর্ষের পুঁজিবাদ শুধু কি পুঁজিবাদ? ভারতবর্ষের পুঁজিবাদ প্রতিক্রিয়াশীল পুঁজিবাদ। তার আর্থিক সম্পর্ক আর প্রগতিশীল নেই। একটা কথা এখানে আমি সমস্ত তথাকথিত মার্কসবাদী-লেনিনবাদী বন্ধুদের বিচার করতে বলি। ভারতবর্ষের পুঁজিবাদ যে একচেটে পুঁজির জন্ম দিয়েছে, একথা সকলেই স্বীকার করছেন। সকলেই বলছেন, একচেটে পুঁজিপতিদের বিরুদ্ধে লড়তে হবে। একমাত্র নকশালপন্থী বন্ধুদের বাদ দিলে সমস্ত তথাকথিত মার্কসবাদী-লেনিনবাদীরাই মনে করেন, এই একচেটে পুঁজি হচ্ছে বৃহৎ শিল্পপুঁজি — অর্থাৎ ইন্ডাস্ট্রিয়াল পুঁজিই একচেটিয়া পুঁজিবাদে রূপান্তরিত হয়েছে। মাও সে-তুঙ তাঁর বিভিন্ন দলিলে প্রাক্-বিপ্লব চীনের যে মনোপলি গোষ্ঠীর কথা উল্লেখ করেছেন, অর্থাৎ মনোপলি কম্প্রাডর গোষ্ঠী, যারা বিদেশের পণ্য নিয়ে ব্যবসাবাণিজ্যের কারবার করে — এখানে একচেটে পুঁজি বলতে সেই মনোপলি গোষ্ঠী বোঝানো হচ্ছে না। এখানে শিল্পপুঁজি যে একচেটে পুঁজিতে রূপান্তরিত হয়েছে, সকলেই তাই বলছেন। সি পি আই বন্ধুরাও বলছেন, সি পি আই(এম) বন্ধুরাও বলছেন। অন্যান্য তথাকথিত মার্কসবাদীরাও তাই মানেন। তাহলে মার্কসবাদী সংজ্ঞা অনুযায়ী পলিটিক্যাল ইকনমিতে এই একচেটে পুঁজি কথাটার মানে কী? যদি তাঁরা নিজেদের লেনিনবাদী বলেন, তাহলে লেনিনবাদ অনুযায়ী অর্থনীতির কোন স্তরে পুঁজিবাদ সাম্রাজ্যবাদের স্তরে অনুপ্রবেশ করে, একথা তাদের বলতে হবে। এটা তো একেবারে পরীক্ষিত সত্য, যার বাইরে যাওয়ার উপায় নেই। সমস্ত জায়গায়ই ইতিহাসে পুঁজিবাদ আসে তার দুটো ঝোঁক নিয়ে। প্রথমে সে আসে প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে পুঁজিবাদ গড়ে তোলবার জন্য, পুঁজিবাদী জাতীয় বাজার সৃষ্টি করবার জন্য একটা জাতীয় রাষ্ট্র গঠন করতে। তারপর পুঁজিবাদের অন্তর্দ্বন্দ্বের জন্য, শোষণের জন্য, ন্যায্য মজুরি ফাঁকি দেওয়ার জন্য একদিকে মজুরদের অবস্থা নিম্নগামী হতে থাকে, অন্যদিকে ধীরে ধীরে পুঁজি কিছু লোকের হাতে কুক্ষিগত হয় এবং এই প্রক্রিয়ায় একচেটে পুঁজিপতি গোষ্ঠীর জন্ম হয়। অবাধ প্রতিযোগিতা একটা কথার কথায় পর্যবসিত হয়। কিছু প্রতিযোগিতা থাকে ঠিকই পুঁজিবাদে, কিন্তু অবাধ প্রতিযোগিতা 'লেসে ফেয়ার' থাকে না। পুঁজিবাদের সেই যুগ আর নেই। দুনিয়ায় কোথাও নেই, ভারতবর্ষেও নেই। ছোট ছোট শিল্পপতি, ছোট ছোট পুঁজির কারবার যাঁরা করেন — তাঁদের পণ্য, তাঁদের প্রভাব সমস্ত কিছু ব্যাঙ্কিংকে কন্ট্রোল করার মধ্য দিয়ে একাধিকার পুঁজিপতি যাদের আমরা বলি, সেই একচেটে পুঁজিপতিরা নিয়ন্ত্রণ করে।

ভারতবর্ষের পুঁজিবাদ সাম্রাজ্যবাদী চরিত্র অর্জন করেছে

ব্যাঙ্কিং পুঁজি এবং শিল্পপুঁজি প্রথম প্রথম ভারতবর্ষেও আলাদা ছিল। একে অপরের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করত, আবার পরস্পরকে সাহায্য করত। এখন যেমন একটা ইনটিগ্রেটেড গোষ্ঠী ব্যাঙ্ককে এবং শিল্পকে একই সঙ্গে নিয়ন্ত্রণ করছে, এ পরিস্থিতি আগে ছিল না। আজকে সেই ইনটিগ্রেশন সম্পূর্ণ হয়ে গিয়েছে। ব্যাঙ্কিং পুঁজি আর শিল্পপুঁজির মিলন হয়ে গিয়েছে। হয়ে গিয়ে এখন একটিই পুঁজিপতি গোষ্ঠী ব্যাঙ্ক এবং শিল্প — এই দুটোকেই নিয়ন্ত্রণ করছে এবং এইভাবে আমাদের দেশে একটি ধনকুবের গোষ্ঠী, যাকে ইংরেজিতে আমরা বলি ফিন্যানসিয়্যাল অলিগার্কি, তার সৃষ্টি হয়েছে। এই অবস্থা হলেই অর্থনীতিতে ফিন্যান্স ক্যাপিট্যাল, বা 'লগ্নি পুঁজি'র জন্ম হয় — যে লগ্নি পুঁজি ব্যাঙ্ককে কন্ট্রোল করার মধ্য দিয়ে, শেয়ার মার্কেটকে কন্ট্রোল করার মধ্য দিয়ে জাতীয় জীবনের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে কৃষি পণ্য থেকে শুরু করে ছোট ছোট উৎপাদন পর্যন্ত সমস্ত কিছুর উপরে জাল বিস্তার করে শোষণ চালায়। এবার ভারতবর্ষের চেহারাটা একবার মিলিয়ে দেখুন। ভারতবর্ষেও কি এই ধনকুবের গোষ্ঠী ব্যাঙ্ককে কন্ট্রোল করার মধ্য দিয়ে সমস্ত বাজারকে নিয়ন্ত্রণ করছে না।

সবশেষে খুব গুরুত্বপূর্ণ যে জিনিসটির বিচার করা দরকার, তা হচ্ছে, পুঁজির রপ্তানি। পণ্য রপ্তানি সমস্ত পুঁজিবাদী দেশই করে। অন্যান্য দেশও করে। নিজ নিজ দেশের শিল্প বিকাশের জন্য এটা করা দরকার। কিন্তু পণ্য রপ্তানি করলেই একটা পুঁজিবাদী দেশ তৎক্ষণাৎ সাম্রাজ্যবাদী দেশ হয়ে যায় না। একটা পুঁজিবাদী দেশ,

অনগ্রসর পুঁজিবাদী দেশ হলেও, পুঁজি তার যখন বাড়তি হয়ে যায়, নিজের দেশের বাজারের মধ্যে কাজ করতে পারে না, তখন সে পণ্য রপ্তানির সাথে সাথে পুঁজিও রপ্তানি করতে শুরু করে — অর্থাৎ পুঁজি নিয়ে বাইরের বাজার লুণ্ঠন করার জন্য যায়। ধরুন, পণ্যদ্রব্য বিদেশের বাজারে রপ্তানি করে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে বিক্রি করার মধ্য দিয়ে কিছু লাভ হয়তো পুঁজিপতিরা নিয়ে আসে। কিন্তু সেখানকার শ্রমশক্তি আর কাঁচামালকে লুণ্ঠন করার সুযোগ পণ্য রপ্তানির মধ্য দিয়ে হয় না। আর, পুঁজি রপ্তানির মধ্য দিয়ে কী করা হয়? পুঁজি রপ্তানির মধ্য দিয়ে সেই দেশে পুঁজি বিনিয়োগ করে সেই দেশের কাঁচামাল এবং শ্রমশক্তিকে লুণ্ঠন করে এদেশের ধনকুবেরদের পেট মোটা করা হয়। এইখানেই পুঁজি রপ্তানির সঙ্গে পণ্য রপ্তানির মৌলিক পার্থক্য। যে স্তরে এসে পুঁজিবাদ এই পুঁজি রপ্তানি শুরু করে, তাকেই আমরা অর্থনীতির ভাষায় সাম্রাজ্যবাদ বলি। তাহলে ভারতবর্ষের পুঁজিবাদ ইউরোপের ধনী পুঁজিবাদী দেশগুলোর তুলনায় আজও পিছিয়ে-পড়া পুঁজি হলেও তার চরিত্রে এই সাম্রাজ্যবাদী বৈশিষ্ট্যগুলো ধীরে ধীরে দেখা দিচ্ছে কি? এই সাম্রাজ্যবাদী চরিত্র তার পিছিয়ে-পড়া অবস্থার মধ্যেও এসেছে কি? যদি এসে থাকে, তাহলে এ শুধু পুঁজিবাদ নয়, এ ইতিমধ্যেই তার জাতীয় চরিত্র খানিকটা খুইয়ে, অর্থাৎ নষ্ট করে, সাম্রাজ্যবাদী চরিত্র অর্জন করেছে। একথা ঠিক যে, সে এখনও অনেকটা পিছিয়ে আছে। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী চরিত্র যে তার এসে গেছে, তা পুঁজি রপ্তানির চরিত্র ব্যাখ্যা করলে, ফিন্যানসিয়াল অলিগার্কির জন্ম হওয়া ব্যাখ্যা করলে, মনোপলি ব্যাখ্যা করলে এবং লেনিনবাদ মানলে অস্বীকার করবার উপায় নেই।

ভারতবর্ষের বিপ্লব পুঁজিবাদবিরোধী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব

তাহলে এহেন যে পুঁজিবাদ, যার পৃষ্ঠপোষকতা করছে ভারতবর্ষের বর্তমান রাষ্ট্র, সেই রাষ্ট্রটি কি পুঁজিবাদী রাষ্ট্র? অন্য কোনও ব্যাখ্যা দিয়ে বর্তমান ভারতীয় রাষ্ট্রের এই পুঁজিবাদী চরিত্রকে যারা গোলমাল করে ফেলতে চায়, তারা মূল রাজনৈতিক লাইন, অর্থাৎ লড়াইয়ের সামনে মূল রাজনৈতিক উদ্দেশ্যকেই গোলমাল করে দিচ্ছে। তাই আপনাদের বলছিলাম, লড়তে তো চাইছেন, কিন্তু কাকে উচ্ছেদ করবেন? আপনারা জান তো দেবেন, কিন্তু লড়বেন কার বিরুদ্ধে? কে মূল শত্রু? শত্রু যদি সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ততন্ত্র হয়, তাহলে তার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের প্রস্তুতি, সংগঠন প্রণালী এবং মিত্র সমাবেশ এক রকমের হবে। আর শত্রু যদি পুঁজিবাদ হয়, শত্রু যদি বুর্জোয়াশ্রেণী হয় এবং বুর্জোয়াশ্রেণীকে ক্ষমতা থেকে উচ্ছেদ করাই যদি বিপ্লবের মুখ্য উদ্দেশ্য হয়, তাহলে লড়াইয়ের প্রস্তুতি, তার সংগঠন প্রণালী, তার মিত্র সমাবেশ অন্যরকম হবে, রাজনৈতিক চেতনার ভিত্তি অন্যরকম হবে। কাজেই লড়াইয়ের সামনে এটা একটা মুখ্য কথা। এটা এরকম একটা মামুলী কথা নয় যে, আমরাও বিপ্লব চাই, অন্যেরাও বিপ্লব চায়, অথবা লড়লেই বিপ্লবের রাস্তাটা আপনাআপনি এসে দেখা দেবে। এ হল ডেমাগগদের (নীতিহীন রাজনীতিবিদদের), সেল্ফ সিকারদের (আত্মপ্রতিষ্ঠাকামীদের) অথবা বিভ্রান্ত জনসাধারণের, যারা জানে না যে লড়াইয়ের সামনে রাজনৈতিক মতটাই হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন, তাদের বক্তব্য।

এখানে চীনের পার্টির দশম কংগ্রেসের একটা কথা আপনাদের আমি স্মরণ করিয়ে দেব। চীনের পার্টির কথা সকলের ভাল নাও লাগতে পারে এবং আপনাদের মধ্যে কেউ কেউ অপছন্দ করতেও পারেন। অনেকের চীন সম্বন্ধে রাগ থাকতে পারে, নানারকমের মনোভাবনা থাকতে পারে। আমার বক্তব্য হচ্ছে, আপনাদের চীন সম্বন্ধে যার যাই ধারণা থাকুক, এ কথা তো সত্য যে, একটা খাঁটি কথা যদি কেউ বলে, তাহলে শত্রু বললেও তার উপর ধ্যান দেওয়া উচিত। আর, মিত্র বললে তো দেওয়া উচিতই। এমনকী একজন সাধারণ মানুষও একটা খাঁটি কথা বললে তার উপরে ধ্যান দেওয়া উচিত। কারণ, মার্কসবাদ শুধু নয়, সব যুগের মনীষীরাই, যাঁরা সত্যানুসন্ধান করেছেন, তাঁরা এই কথাটা ভুল করেননি যে, একটি অজ্ঞ মানুষও হয়তো অনেক সময় এমন জরুরি একটা কথা বলতে পারে, যে কথাটা বহু অভিজ্ঞতাসম্পন্ন একজন মহান বিপ্লবীও ভাবেননি। কাজেই, একজন অজ্ঞ মানুষের কাছ থেকেও শেখো — এটাই হচ্ছে মার্কসবাদের মূলমন্ত্র। তা চীনা কমিউনিস্ট পার্টি অজ্ঞ তো নয়ই, তবুও বলি, চীন সম্বন্ধে যাঁদের রাগ রয়েছে তাঁরাও কথাটা ভেবে দেখবেন। চীনের পার্টি এতবড় একটা পার্টি হয়েও, এতবড় জনসমর্থন তাদের পিছনে থাকা সত্ত্বেও এবং তাদের হাতে রাষ্ট্রক্ষমতা এবং অমন দুর্ধর্ষ মিলিটারি শক্তি থাকা সত্ত্বেও তারা কিন্তু এ যুক্তি করেনি যে, যেহেতু তারা এতবড়, যেহেতু

তারা বিপ্লব করেছে এবং রাষ্ট্রশক্তি তাদের অধীনে আছে, তখন নিশ্চয়ই তারা ঠিক।

মূল রাজনৈতিক লাইনই হচ্ছে আসল বিচার্য বিষয়

চীনের পার্টি ঠিক এর উল্টো কথাটাই বলছে। চীনের পার্টি বলছে এবং জনগণকে হুঁশিয়ার করে দিচ্ছে যে, পার্টির যদি মূল রাজনৈতিক লাইন ঠিক না হয়, তাহলে শক্তি আজ পার্টির হাতে যতই থাকুক, এমনকী রাষ্ট্রক্ষমতা হাতে থাকলেও শেষ পর্যন্ত তা রক্ষা করা যাবে না। মূল রাজনৈতিক লাইন ঠিক না হলে শক্তি আজ থাকলেও আস্তে আস্তে তাকে ভাঙিয়ে খেয়ে জনসাধারণের এবং দেশের অশেষ অনিষ্ট করে দিয়ে সে একদিন শেষ হয়ে যাবে। তার ফল ভোগ করবে সাধারণ মানুষ। কিন্তু কোনও পার্টির যদি শুরুতে শক্তি নাও থাকে, সে যদি একলাও হয়, তাহলেও তার মূল রাজনৈতিক লাইন যদি ঠিক হয়, আদর্শ ঠিক হয়, নীতি-রাস্তা ঠিক হয়, তাহলে সে ধীরে ধীরে শক্তি সংগ্রহ করবে, এক থেকে দুই হবে, দুই থেকে দু'শো হবে, দশ হাজার হবে, দশ লাখ হবে এবং একদিন সে সমস্ত সমাজকে পাল্টাবে, বিপ্লব সংগঠিত করবে। আমার কথাটা ভাল লেগেছে। তাই আপনাদের স্মরণ করিয়ে দিলাম। আমাদের দেশের গণআন্দোলনের সামনেও এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। এর আগেও আপনারা বহু লড়াই, বহু আন্দোলন করেছেন। যখন লড়াইয়ের ময়দানে আসেন, তখন আপনারা কোনও কথা শুনতে চান না। তখন মাথা আপনাদের খারাপ হয়ে যায়। সেই সময়ে যাদের দলবল বেশি, শক্তি বেশি, যারা বিকল্প হিসাবে অবস্থান করে তাদের দিকেই সব ঝুঁকতে থাকেন। যাদের শক্তি বেশি, রাস্তা তাদের ঠিক কি না, তা বিচার পর্যন্ত করেন না। যদি রাস্তা তাদের ঠিক হয়, তাহলে আমার কথা হচ্ছে — আসুন, সকলেই তাদের সঙ্গে যাই। কিন্তু যাদের শক্তি বেশি, রাস্তা তাদের যদি ভ্রান্ত হয়, ভুল হয়, চালাকির হয়, তাহলে সে রাস্তায় পা দেওয়া উচিত নয়। সেই অবস্থায় স্রোতের বিরুদ্ধে যেতে হবে। কারণ, শক্তি বেশি বলে রাস্তা ভ্রান্ত হলে সে অনিষ্ট বেশি করবে। মরবেন আপনারা, আত্মত্যাগ করবেন আপনারা, গুলি খাবেন আপনারা, কিন্তু অবস্থার পরিবর্তন হবে না।

এখানে আপনাদের একটা কথা বলি। এই যে আন্দোলন হয়, এতে নেতাদের গায়ে আঁচড়ও লাগে না। আমাদের কিছু হয় না। আপনারাই ফল ভোগ করেন। ফলে, ভুল রাস্তা হলে লড়াইয়ে মার খাওয়ার পর আপনাদের মধ্যে আসে হতাশা এবং পরাজয়ের মনোভাব। তখন আপনাদের মনোভাব হয়, সকলকেই দেখলাম, সব পার্টি সমান। কারোর দ্বারা কিছু হবে না। আর, এই সুযোগে প্রতিক্রিয়াশীলরা, পুঁজিপতিরা, শাসকশ্রেণী তাদের রাষ্ট্র-যন্ত্রটাকে আরও মজবুত করবার সুযোগ পায়। আমার কথাগুলো একটু মিলিয়ে দেখবেন। লড়াই আপনারা অনেক করেছিলেন। মহৎ শক্তিশালী বলে আপনারা ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন যুক্ত আন্দোলনে। সেই যুক্ত আন্দোলনে আমরা সকলেই ছিলাম। আমাদের পিছনে আপনারা জনসমুদ্র এসে গিয়েছিলেন। আপনারা লড়তেও চেয়েছিলেন, মরতেও চেয়েছিলেন, কংগ্রেসকেও হারিয়ে দিয়েছিলেন। কবর থেকে সেই কংগ্রেস আবার উঠে এসেছে। আপনারা রক্ষা করতে পারেননি। আপনারা ভয়ে আবার কুঁকড়ে গিয়েছিলেন। আবার কিছুদিন আপনাদের মধ্যে চলেছে হতাশা আর পরাজয়ের মনোভাব। কারণ, রাস্তা আপনারা ঠিক করতে চাননি, মূল রাজনৈতিক লাইন ঠিক করতে চাননি। আপনাদের মনোভাব ছিল লড়াইয়ের থেকেই রাস্তা আপনাআপনি ঠিক হয়ে যাবে। বিপ্লব যখন চাইছেন, তখন সেইটাই আসল কথা। কিন্তু, কী বিপ্লব আপনারা চান? যেমন ধরুন, অনেকে বলছেন, কৃষি বিপ্লব করতে হবে। কারণ, কৃষি বিপ্লবই নাকি ভারতবর্ষের বিপ্লবের প্রাণকেন্দ্র। আমি বলি, ভাল কথা। কিন্তু আমি তাদের সকল কর্মীদের ভেবে দেখতে বলব যে, কৃষি বিপ্লবই যদি ভারতবর্ষের বিপ্লবের মূল কেন্দ্রবিন্দু হয়, সেই কৃষি বিপ্লবটা রাষ্ট্র বিপ্লব তো? অর্থাৎ কৃষি বিপ্লবটা রাষ্ট্র উচ্ছেদের বিপ্লব তো? নাকি কৃষি বিপ্লবটা ঐ গান্ধীবাদীদের মতো অর্থনৈতিক বিপ্লব করার একটা বিপ্লব? তা যদি না হয়, কৃষি বিপ্লবটা যদি রাষ্ট্র বিপ্লব হয়, তাহলে পুঁজিবাদী রাষ্ট্র উচ্ছেদ ব্যতিরেকে কৃষি বিপ্লবের যে কাজ বাকি রয়েছে, অর্থাৎ কৃষির আধুনিকীকরণ করা, তা কি করে সম্পূর্ণ হবে? আর, তা না হলে, কৃষি বিপ্লবের কার্যক্রম হল, বর্তমান রাষ্ট্র কাঠামোটির মধ্যেই ইলেকশনে সরকার গঠন করে ভূমি সংস্কারের কার্যক্রম বুর্জোয়ারা যেমন নিচ্ছে, একটু শব্দগত পার্থক্য ছাড়া সেই বুর্জোয়াদের ভূমি সংস্কারের কার্যক্রমেরই অনুরূপ একটি কার্যক্রম মাত্র।

আমাদের প্রস্তাবিত আন্দোলনের কর্মসূচি গৃহীত হয়নি

তাহলে গণআন্দোলনের সামনে এইগুলিই হচ্ছে মূল কথা। পশ্চিমবাংলাতেও আন্দোলন যেভাবেই হোক, তার দিকে আবার আমরা ধীরে ধীরে এগোচ্ছি। যদিও একটা কথা এখানে আপনাদের আমি মনে করিয়ে দেব। যখন কংগ্রেসের দাপটে মানুষ ভয়ে ভীত এবং সন্ত্রস্ত, বিভিন্ন পার্টির রাজনৈতিক কর্মীরাও অত্যাচারের সামনে ভীত-সন্ত্রস্ত, মুখ খোলবারই উপায় নেই, এরকম একটা অস্বস্তিকর পরিস্থিতি চলছে; কংগ্রেসের বিরুদ্ধে মানুষ বিক্ষুব্ধ হলেও সাহস করে কিছু বলতে পারছে না, অথচ মানুষ চাইছে একটা কিছু হোক, কিন্তু কেউ উদ্যোগ নিয়ে কিছু করছে না বলে মানুষও কিছু করতে পারছে না — ঐরকম সময়ে নভেম্বর নাগাদ আমাদের পার্টির পক্ষ থেকে সি পি আই (এম) সহ অন্যান্য বামপন্থী দলের কাছে বলা হল, জনসাধারণ এখনই আন্দোলনে আসতে পারছে না, কিন্তু তারা আন্দোলন চাইছে। ফলে, জনসাধারণের এই ভয় ভাঙাবার জন্য — আমাদের পার্টি ক্যাডারদের, ভলান্টিয়ারদের তো ভয় নেই —আসুন, আমরা আইন অমান্য করতে থাকি। জনসাধারণের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে যদি আমরা আইন অমান্য আন্দোলনের রূপে যাই, অত্যাচারের মোকাবিলা করি, তাহলে লড়াইয়ের আবহাওয়া সৃষ্টি করে জনসাধারণের মধ্যে লড়াইয়ের মনোভাবটা আবার আমরা ফিরিয়ে আনতে পারব। সেই অবস্থায় জনসাধারণ আবার উদ্যোগ নিয়ে এগিয়ে আসবে। কিন্তু সেই সময়ে আমরা যে আইন অমান্য আন্দোলনের কর্মসূচি দিয়েছিলাম, তা তাঁরা গ্রহণ করলেন না। বরং আমরা যখন বিভিন্ন বামপন্থী দলের কাছে সেই কর্মসূচি দিলাম, তখন আমাদের মহাবিপ্লবী বলে ব্যঙ্গ করে সি পি আই (এম) নেতারা বললেন যে, আইন অমান্য কোনও একটা আন্দোলনই নয়, বরং একটা বন্‌ধ ডেকে দিন। এর মানে হচ্ছে, এই বন্‌ধ ডাকার ক্ষেত্রে আমাদের কোনও দায়দায়িত্ব থাকবে না। আমরা উপর থেকে একটা বন্‌ধ ডেকে দিয়ে ঘরে বসে থাকব। তারপর জনসাধারণের মধ্যে বিক্ষোভ আছে, তারা বন্‌ধ করলে করবে, না করলে না করবে। আপনারা লক্ষ করে দেখবেন, এইভাবে বারবার প্রস্তুতিবিহীন বন্‌ধ বা ধর্মঘট ডেকে দিয়ে গণআন্দোলনের এতবড় একটা অস্ত্রের ধার ক্রমাগত কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। এটা অনেকে না বুঝে আজ লক্ষ করছেন না, কিন্তু এই ষড়যন্ত্র এখানে চলছে। ঠিক এইভাবেই ঘেরাও-এর মতো শক্তিশালী একটা অস্ত্রের ধারকেও যুক্তফ্রন্ট সরকারের আমলে যথেচ্ছ প্রয়োগ করে কমিয়ে দেওয়া হয়েছিল। আমরা বারবার হুঁশিয়ারি দেওয়া সত্ত্বেও সেদিন আমাদের কথায় কেউই কর্ণপাত করেনি। আজ তার ফল দেশের মানুষকে গুণে গুণে দিতে হচ্ছে।

আবার আজকে দেখুন। আজ মানুষের মধ্যে ভয় অনেক ভেঙে গিয়েছে। মানুষ আজ লড়তে চাইছে। তারা কথা বলছে, মুখ খুলছে। লড়াইয়ের একটা আবহাওয়া তৈরি হয়েছে। গুজরাট এবং বিহারের আন্দোলন পশ্চিমবাংলার মানুষকেও প্রায় উত্তেজিত করে তুলেছে। জনসাধারণই আজ প্রশ্ন করছে, পশ্চিমবাংলায় আন্দোলন হচ্ছে না কেন? তারা চাইছে, একটা লড়াই হোক। এই অবস্থায় জনসাধারণ যেখানে বর্তমানে লড়তে চাইছে, সেখানে তাদের লড়াইকে সংগঠিত রূপ দেওয়ার পরিবর্তে এখন তাঁরা বলছেন, আইন অমান্য হোক। আমি মনে করি, আন্দোলনের সময় একটা মুখ্য বিচার্য বিষয়। আমার মতে এখন আইন অমান্যের কর্মসূচির মানে হচ্ছে, জনগণের সংগঠিত প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলবার যে তেজটা বর্তমান রয়েছে, তাতে ঠাণ্ডা জল ঢালা। অর্থাৎ যে জনসাধারণ লড়তে চাইছে তাকে নিষ্ক্রিয় করে দেওয়া। এর মানে হচ্ছে, জনসাধারণ এখন দর্শক হবে, আর আমরা আইন অমান্য করব এবং করে তাদের হাততালি নেব। যে সময়ে আইন অমান্য আন্দোলনের কর্মসূচি নেওয়া দরকার ছিল, তখন তাঁরা বলে দিলেন ওটা গান্ধীবাদী কর্মসূচি। আমাদের ঠাট্টা করে বললেন, আমরা বিপ্লবী হয়ে কী করে যে গান্ধীবাদী প্রোগ্রাম দিই, তার মাথামুণ্ডু নাকি তাঁরা কিছুই বোঝেন না। আবার যখন আজ জনতা লড়তে চাইছে, যখন তার লড়াইয়ের হাতিয়ার গড়ে তোলা দরকার, তখন তাঁরা সেই গান্ধীবাদী প্রক্রিয়াটি এনে জনতার ঘাড়ে চাপালেন। যেটা গান্ধীজির একটা নীতি ছিল। গান্ধীজি চাইতেন, লড়াইয়ে যখন জনতা এগিয়ে যেতে চাইছে, তখন লড়াইয়ের প্রক্রিয়াটি এমনভাবে গড়ে তোলা যাতে জনতার রাজনৈতিক শক্তি একটা সুষ্ঠু রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিতে কখনই গড়ে উঠতে না পারে। তার জন্য কোনও সময় জনসাধারণকে সংগঠিত রূপে আন্দোলন গড়তে দিও না। জনতার বিক্ষোভ, বিচ্ছিন্ন বিস্ফোরণের রূপে কোথাও কোথাও ফেটে পড়লেও সত্যাগ্রহের দ্বারা তার উপর ঠাণ্ডা জল ঢেলে দাও এবং সত্যাগ্রহীরা 'হিরো' হও। জনগণ শুধুমাত্র নীরব দর্শক হিসাবে তাদের তারিফ করতে থাকুক, আর তোমরা

ইলেকশনে এবং রাজনীতিতে তাকে মূলধন কর।

সি পি আই (এম)-এর ভ্রান্ত রাজনীতি

আজকের গণআন্দোলনে সি পি আই (এম) নেতৃত্বও সেই দিকেই চলছে। তাহলে, এটা তো মূল রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রশ্ন। তাদের ক্ষেত্রে এ জিনিস বারে বারে কেন ঘটছে? যখন যেটা করার কথা, তখন তারা সেটা করবেন না। আর, যখন যেটা করার কথা নয়, তখন ঠিক সেইটিই করবেন। যেমন, স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় যখন জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীকে কংগ্রেসের নেতৃত্ব থেকে বিচ্ছিন্ন করে তার উপর শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার দ্বারা কংগ্রেসকে একটি সাম্রাজ্যবাদবিরোধী 'পিপ্‌ল্‌স্‌ ফ্রন্ট' হিসাবে রূপ দেওয়া প্রয়োজন ছিল এবং তার সম্ভাবনাও বর্তমান ছিল, তখন তাঁরা তা করলেন না। বরং তার পরিবর্তে প্রথমে ১৯৩০ সালে রণদিভের নেতৃত্বে গোটা স্বাধীনতা আন্দোলনটাকেই প্রতিক্রিয়াশীল বুর্জোয়াদের আন্দোলন বলে আখ্যা দিয়ে তার থেকে নিজেদের সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন রেখে কংগ্রেসের মধ্যে বুর্জোয়াশ্রেণীর নেতৃত্বকেই শক্তিশালী হতে সাহায্য করলেন। আবার ১৯৩৪ সালে এসে সেই প্রতিক্রিয়াশীল বুর্জোয়াশ্রেণীকেই জনগণের কাছে তাঁরা এত প্রগতিশীল হিসাবে তুলে ধরলেন যে, তাদের সঙ্গে একেবারে 'ন্যাশন্যাল ফ্রন্ট'-এর স্লোগান তুললেন এবং একইভাবে কংগ্রেসের মধ্যে জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর নেতৃত্বকেই আরও পাকাপোক্ত করতে অধিক সাহায্য করলেন। স্বাধীনতা আন্দোলনের পরেও তাঁরা বারবার এই আচরণই করে এসেছেন। আমি এখানে তার দীর্ঘ ফিরিস্তি দিতে চাই না। অন্যত্র এবিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা আমি করেছি।

আজ আবার দেখুন, যখন পুঁজিবাদবিরোধী বিপ্লব সফল করার জন্য, পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে আঘাত হানবার জন্য, জনসাধারণকে পুঁজিবাদবিরোধী করে গড়ে তোলবার প্রশ্ন অত্যন্ত জরুরি হয়ে দেখা দিয়েছে, তখন তাঁরা তা না করে সামন্ততন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদবিরোধী বিপ্লবের কথা বলছেন, উল্টোটি করছেন। অথচ ভারতবর্ষের বর্তমান রাষ্ট্রটি যে বুর্জোয়া রাষ্ট্র এবং বুর্জোয়া শ্রেণীশাসন ও শোষণই যে আমাদের দেশে চলছে, কোনও বিচারেই তাকে এড়াবার উপায় নেই। আমি আপনাদের কাছে খানিকটা আলোচনা করে দেখালাম, ভারতবর্ষের পুঁজিবাদ শুধু পুঁজিবাদ নয়, এ নিজে খানিকটা সাম্রাজ্যবাদী চরিত্রও অর্জন করেছে। কৃষি অর্থনীতিতে ভূমি সম্পর্কের ক্ষেত্রে সামন্তী সম্পর্ক কোথাও নেই। এমনকী, আমি এটাও আপনাদের সামনে আলোচনা করে দেখিয়েছি যে, শুধুমাত্র জমি বণ্টনের পরিকল্পনার দ্বারা কৃষি অর্থনীতির সমস্যার সমাধান হবে না; যদিও সেটা আমাদের বামপন্থী আন্দোলনের একটা দাবি, অন্যান্য দলও লড়ে, আমরাও লড়ি। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে চাষীকে সচেতন করা হয় যে, চাষী সমস্যার সমাধান এ পথে হবে না। তার সমস্যা সমাধানের মূল প্রশ্নটি পুঁজিবাদী রাষ্ট্র উচ্ছেদ করে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রশ্নের সাথে জড়িত। কারণ, কৃষির আধুনিকীকরণের প্রশ্নের সাথে তা জড়িত, শিল্পবিপ্লবের অগ্রগতির দ্বার খুলে দেওয়ার সঙ্গে তা জড়িত। আর, এ সব কিছুর পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে আমাদের দেশের পুঁজিবাদী উৎপাদন-সম্পর্ক, অর্থাৎ মালিক-মজুর সম্পর্ক, আর পুঁজিবাদী উৎপাদনের উদ্দেশ্য, অর্থাৎ সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জন। তাহলে এরকম অবস্থায় গণআন্দোলনের সামনে এই মূল রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি কার আছে, তা আপনাদের বিচার করতে হবে।

গণআন্দোলনগুলিকে সঠিক বিপ্লবী লক্ষ্যে পৌঁছে দিতে হলে তিনটি শর্ত পূরণ করতে হবে

মনে রাখবেন, গণআন্দোলনকে যদি আপনারা সঠিক বিপ্লবী লক্ষ্যে পৌঁছে দিতে চান, তাহলে প্রথমত আপনাদের প্রয়োজন, এই সঠিক বিপ্লবী রাজনৈতিক লাইন। দ্বিতীয়ত, আপনাদের প্রয়োজন সেই বিপ্লবী রাজনৈতিক লাইনের উপযুক্ত — অর্থাৎ সেই বিপ্লবী রাজনৈতিক লাইনকে কার্যকরীভাবে রূপ দেওয়ার মতো উপযুক্ত — বিপ্লবী রাজনৈতিক দল। এই সঠিক বিপ্লবী রাজনৈতিক দল শুধু তত্ত্বে উপস্থিত হলে হবে না, দেখতে হবে সে যথার্থ শক্তিশালী কি না। যদি অবস্থাকে কার্যকরীভাবে নিয়ন্ত্রণ করার মতো যথার্থ শক্তিশালী সে না হয়, তাহলে তাকে শক্তি জোগাতে হবে। যেমন করে মা শিশুকে শক্তি জোগায়, তেমন করে আপনাদের শক্তি জোগাতে হবে। এ দায়িত্ব জনগণের। এ দায়িত্ব সকলের। মনে রাখবেন, যে সমস্ত রাজনৈতিক দল ভ্রান্ত এবং যাদের মূল রাজনৈতিক লাইনই ভুল, তাদের শক্তি থাকলে সেটা আতঙ্কের বিষয়। কারণ, তারা অনিষ্ট করবে। তাই কোনও দলের রাজনীতি যদি ঠিক থেকে থাকে এবং সেই দলই যদি বিপ্লবের একমাত্র ভরসাস্থল হয়, তাহলে তার শক্তি কম থাকলে তাকে শক্তিশালী করাই হল আপনাদের কাজ। তৃতীয়ত

আপনাদের দরকার জনসাধারণের লড়াইগুলি পরিচালনার জন্য সংগ্রামের একটি হাতিয়ার, যাকে আমরা বলি জনগণের সংযুক্ত মোর্চা। এই সংযুক্ত মোর্চা এই জন্যই দরকার যে, আমাদের দেশে বুর্জোয়া পার্লামেন্টারি ব্যবস্থা আজও বিরাজ করছে। আমরা চাই বা না চাই এটা বিরাজ করছে, আমরা তাকে বাংকাম (বাজে জিনিস) মনে করলেও এটা বিরাজ করছে। তার প্রভাব বর্তাচ্ছে। দেশের অভ্যন্তরে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পরিবেশ একটা মেকি পরিবেশ হলেও রয়েছে এবং সেখানে বারবার ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক, জনতা আসছে এবং রাজনৈতিক দলগুলোকে যেতে হচ্ছে। ফলে, এই অবস্থায় বৃহত্তর জনসাধারণ থেকে বিচ্ছিন্ন হতে না চাইলে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রক্রিয়াটিকে এড়িয়ে গিয়ে শর্টকার্ট (সোজাপথ) কিছু নেই। অন্তত আমার চোখে পড়ছে না। সেই অবস্থায় বিভিন্ন বামপন্থী ও গণতান্ত্রিক দলগুলির সর্বোচ্চ সাধারণ বোঝাপড়ার নীতিতে গৃহীত সর্বসম্মত সাধারণ কর্মসূচির ভিত্তিতে একটি রাজনৈতিক যুক্তফ্রন্ট গড়ে তোলা প্রয়োজন। এক্ষেত্রেও এই সাধারণ বোঝাপড়ার নীতিটি কী হবে, তা ভাল করে বোঝা দরকার। কারণ, আপনারা লক্ষ করে দেখবেন, সেখানেও নীতির কোনও বালাই কাজ করছে না।

আমাদের দল মনে করে, আজকের দিনে কোনও গণতান্ত্রিক আন্দোলন, সত্যিকারের অর্থে গণতান্ত্রিক হতে পারে না, যদি তা কমিউনিজমবিরোধী বায়াসের (উগ্র মনোভাবের) দ্বারা পরিচালিত হয়। কোনও দল মার্কসবাদী না হতে পারে, কমিউনিস্ট না হতে পারে, কিন্তু কমিউনিস্ট বিদ্বেষী হলে সেই দল আজকের দিনে যথার্থ গণতন্ত্রীও হতে পারে না। সাম্রাজ্যবাদবিরোধী নাহলে কোনও দল আজকের দিনে যথার্থ গণতন্ত্রী হতে পারে না। তাই এই সংযুক্ত মোর্চায় যে সমস্ত দল আসবে তাদের আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদ এবং সাধারণভাবে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী হতে হবে এবং তাদের কমিউনিস্ট ও মার্কসবাদী-লেনিনবাদী দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি সমর্থনসূচক মনোভাব থাকতে হবে। এই দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তিতে যে সমস্ত দল পুঁজিবাদী শোষণকে মোকাবিলা করার জন্য কংগ্রেসের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে আসবে, কংগ্রেস আজ শাসক পার্টি আছে বলেই তার বিরুদ্ধে, সেই সমস্ত দলগুলিকে নিয়ে সর্বসম্মত কর্মসূচির ভিত্তিতে, অর্থাৎ যেগুলো সর্বসম্মত হবে না সেগুলো বাদ দিয়ে একটি সম্মিলিত মোর্চা গড়ে তুলতে হবে, যে মোর্চাটা হবে জনগণের নিজস্ব সংগ্রামের হাতিয়ার। সমস্ত দলের প্রভাবিত জনতা এই যুক্ত মোর্চার কর্মসূচি নিয়ে একত্রে লড়াইয়ের ময়দানে নামবে। তাছাড়া, এই যুক্তফ্রন্ট গড়ে তোলার আর একটা প্রয়োজনীয়তাও আছে। তা হচ্ছে, যুক্তফ্রন্ট গড়ে তুলে বিভিন্ন মতাবলম্বীদের প্রভাবান্বিত জনতা যখন একসঙ্গে লড়ে তখন একত্রে লড়তে গিয়ে বিভিন্ন দলের রাজনীতি, নেতাদের আচরণ, নেতাদের বক্তব্য, লড়াই পরিচালনার কায়দা, কারা কোন সময় জনতাকে কোনদিকে নিয়ে যেতে চাইছে — এগুলোও পাশাপাশি রেখে তারা বিচার করতে পারে। অর্থাৎ এক কথায় একত্রে লড়াই করার মধ্য দিয়ে মেকি মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টিগুলির সাথে সত্যিকারের মার্কসবাদী-লেনিনবাদী বিপ্লবী দলের পার্থক্য নিরূপণ করতে জনসাধারণ সক্ষম হয়।

এখানে একটা কথা আপনারা মনে রাখবেন। তা হচ্ছে, আমাদের দেশে সোস্যাল ডেমোক্রেসি আজ কমিউনিস্ট আন্দোলনের মধ্যেই একটা শক্তিশালী ধারা হিসাবে কাজ করে চলেছে, যা শ্রম ও পুঁজির মধ্যে আপসকামী শক্তি হিসাবে অবস্থান করছে। যুক্ত আন্দোলনের মধ্যে তীব্র মতাদর্শগত সংগ্রাম পরিচালনার দ্বারা গণআন্দোলনের মূল স্রোত থেকে এই সব বিভিন্ন সোস্যাল ডেমোক্রেটিক শক্তিগুলিকে রাজনৈতিকভাবে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করে বিচ্ছিন্ন করতে না পারলে পুঁজিবাদবিরোধী বিপ্লব সংগঠিত করা কোনওমতেই সম্ভব হতে পারে না। প্রসঙ্গত স্ট্যালিনের একটা বিখ্যাত উক্তি আমি আপনাদের মনে করিয়ে দিই। তিনি বলেছেন, "ইট ইজ ইমপসিবল টু পুট অ্যান এন্ড টু ক্যাপিট্যালিজম উইদাউট পুটিং অ্যান এন্ড টু সোস্যাল ডেমোক্রেটিজম ইন দ্য লেবার মুভমেন্ট" — অর্থাৎ সোস্যাল ডেমোক্রেসিকে পরাস্ত করা ছাড়া আপনারা পুঁজিবাদকে উচ্ছেদ করতে পারেন না। স্ট্যালিনের এই উক্তিটি অনুধাবন করতে পারলেই বুঝতে পারা যাবে, যুক্ত আন্দোলনের মধ্যে কেন আমরা সি পি আই (এম) নেতৃত্বের বিরুদ্ধে এত তীব্র মতাদর্শগত সংগ্রাম পরিচালনা করি এবং এটা বুঝতে পারলেই সি পি আই (এম)-এর কর্মী-সমর্থকরাও ধরতে পারতেন আমাদের এই সমালোচনা সি পি আই (এম)-এর নেতৃত্বের প্রতি কোনও বিদ্বেষপ্রসূত মনোভাব থেকে পরিচালিত নয়। ফলে, সংগ্রামের হাতিয়ার এই যুক্তফ্রন্ট একদিকে যেমন জবরদস্ত সংঘবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলবার জন্য দরকার, অপরদিকে এর দ্বারা জনসাধারণের, এত তত্ত্ব যারা বিচার করতে পারে না তাদের, যুক্তফ্রন্টের অভ্যন্তরে বিভিন্ন দলের

নেতাদের বাস্তব ব্যবহার, তাদের রুচি, আচার-আচরণ, শিক্ষা, জীবন, কর্মপদ্ধতি, সংগ্রাম পরিচালনার কায়দা প্রভৃতির দ্বারা কোন পার্টিটি সত্যিকারের বিপ্লবী পার্টি তা বিচার করে নেওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হতে পারে। তাহলে গণআন্দোলনের সামনেই এই তিনটি শর্ত পূরণ হওয়া চাই।

পুঁজিবাদবিরোধী বিপ্লবের পরিপূরক হিসাবে গণআন্দোলনগুলি গড়ে তুলুন

আপনাদের মনে রাখতে হবে, সমস্ত আন্দোলন যেখানেই তার শুরু হোক — তা খাদ্য নিয়ে শুরু হোক, গণতান্ত্রিক অধিকার নিয়ে শুরু হোক, বিক্ষোভ দিয়ে শুরু হোক, অর্থনৈতিক সংগ্রাম দিয়ে শুরু হোক — সেই আন্দোলনগুলোর মধ্য দিয়ে জনসাধারণকে পুঁজিবাদবিরোধী করে গড়ে তুলতে হবে। কারণ, এই আন্দোলনগুলোকে যদি না পুঁজিবাদকে উচ্ছেদ করবার, অর্থাৎ বিপ্লবের মধ্য দিয়ে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা ভেঙে ফেলার জায়গায় নিয়ে যেতে পারি, তাহলে যত গণতান্ত্রিক অধিকার আমরা আদায় করি না কেন, যত মাইনে আমরা বাড়াই না কেন, তার দ্বারা জনগণের অবস্থার কোনও মৌলিক পরিবর্তন হবে না। এ প্রসঙ্গে লেনিনের একটা বিখ্যাত উক্তি আপনাদের স্মরণ করিয়ে দিই। তিনি মজুরদের এক সময় বলেছিলেন, বুর্জোয়া ব্যবস্থায়, পুঁজিবাদী ব্যবস্থায়, ট্রেড-ইউনিয়ন আন্দোলনের মধ্য দিয়ে যত তারা তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার সম্প্রসারিত করুক, যত আর্থিক দাবি আদায় করুক — একে তো তা করার জন্য বহু রক্তক্ষয় তাদের করতে হবে — কিন্তু কোনওমতেই তার দ্বারা তাদের দুরবস্থার পরিবর্তন হবে না। তারা যে গোলাম সেই গোলামই থাকবে। তাদের সন্তানসন্ততিরাও গোলাম থাকবে। তাদের নাতিপুতিরাও তাই থাকবে। তার দ্বারা পুঁজিবাদ পাল্টাবে না এবং তাদের অবস্থারও পরিবর্তন হবে না। তাদের চাই ইম্যানসিপেশন — অর্থাৎ সর্বপ্রকার শোষণ থেকে মুক্তি। আর, তা পেতে হলে তাদের সমস্ত লড়াইগুলোর মধ্য দিয়ে পুঁজিবাদকে উচ্ছেদ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে, যেটাই মূল রাজনৈতিক লাইনের আসল কথা। তাহলে ভারতবর্ষে আজ যাঁরা জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব, জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব বা কৃষি বিপ্লবের কথা বলছেন, সেগুলো যদি রাষ্ট্রবিপ্লব হয়, তাহলে তা পুঁজিবাদবিরোধী বিপ্লব ছাড়া আর কিছু হতে পারে না। আর তা না হলে বিপ্লবের নামে এগুলো একটাও রাষ্ট্রবিপ্লব নয়। এগুলো হচ্ছে সরকারের গদিতে গিয়ে কতকগুলো সংস্কার প্রবর্তনের বিপ্লব মাত্র। তাহলে সেই বিপ্লবের সঙ্গে জনগণের, যারা তাদের অবস্থার আমূল পরিবর্তন করতে চায়, তাদের সম্বন্ধ কী? অথচ এই শক্তিগুলিকে নিয়েই যুক্তফ্রন্ট গঠন করে জনতাকে ঐকবদ্ধভাবে লড়তে হবে। এরা সকলেই আজ জনগণের দুর্দশার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। তাই এদের সকলকেই একসঙ্গে নিয়ে লড়তে হবে। আর, এই লড়াইয়ের মধ্যে জনতাকে রাজনীতির চর্চার মধ্য দিয়ে সঠিক রাজনৈতিক লাইন, সঠিক রাজনৈতিক দল এবং সংগ্রামের হাতিয়ার গড়ে তুলতে হবে।

বুর্জোয়ারা জাতির নৈতিক মেরুদণ্ড ভেঙে দেওয়ার ষড়যন্ত্র করছে

সর্বশেষ, যে কথাটা আপনাদের সামনে আমি বলব, তা হচ্ছে, পুঁজিপতিদের একটা বড় চক্রান্ত আমাদের দেশে চলছে। একথা ঠিক, আর্থিক দুর্দশা এবং শোষণ আমাদের উপর যথেষ্ট তীব্র। সমস্ত জিনিস সহ্যের সীমা অতিক্রম করে যাচ্ছে। কিন্তু একটা কথা মনে রাখবেন, আর্থিক দুর্দশা এবং অত্যাচার যত চরম রূপই নিক, একটা জাতি শত অত্যাচারের মধ্যেও, একটা দেশের জনসাধারণ শত অত্যাচারের মধ্যেও মাথা তুলে কোমর সিধা করে দাঁড়াতে পারে, যদি সেই জাতির নৈতিক বল অবশিষ্ট থাকে। ভিয়েতনামের দিকে চেয়ে দেখুন। বোমা মেরে মেরে গোটা দেশটাকে মরুভূমি করে দিয়েছে। কিন্তু সেখানকার চাষীরা — অজ্ঞ চাষী, অশিক্ষিত জনসাধারণ ঐ দুর্ধর্ষ শক্তিশালী মিলিটারির বিরুদ্ধে কী অমিত তেজে — একদিন -দু'দিনের লড়াই নয়, বিক্ষোভ নয়, ধর্মঘটের শুধু চালাকি এবং ভেলকি দেখানো নয়, সত্যিকারের সংঘর্ষ করবার শক্তি তারা রেখেছিল। কারণ, সেখানকার জনগণের নৈতিক বল এবং রাজনৈতিক চেতনা একটা উন্নত জায়গায় ছিল। ভারতবর্ষের বুর্জোয়ারাও জানে এবং ইতিহাস থেকে এই শিক্ষা তারা নিয়েছে যে, শুধু অত্যাচার করে, শুধু দমনযন্ত্র দিয়ে, পুলিশ-মিলিটারি দিয়ে পিটিয়ে হয়তো তারা জনতাকে শেষ পর্যন্ত ঠাণ্ডা রাখতে পারবে না। তাই বুর্জোয়াদের চক্রান্ত হচ্ছে, অতি সুকৌশলে জাতির মেরুদণ্ড ভেঙে দাও, নৈতিক মেরুদণ্ড ভেঙে দাও। লোভ, কাপুরুষোচিত আক্রমণের প্রবণতা, অশালীনতা, হীনমন্যতা, তোষামোদ, ব্যক্তিগত প্রয়োজনে তোষামোদ — তোষামোদ

করা একটা অপরাধ, আর যারা তোষামোদ করে তাদের খাতির করা তার চেয়েও ঘৃণিত অপরাধ — এই সমস্ত নীচ বৃত্তিগুলো অতি স্বাভাবিকরূপে সমাজের মানুষের মধ্যে চালু করে দাও। তাই তারা অতি সুন্দরভাবে সংস্কৃতির স্বাধীনতার নামে নানা যুক্তিজাল বিস্তার করে মানুষের নৈতিক অধঃপতন ঘটাতে সমস্ত দিক থেকে সাহায্য করছে। তারা জাতির মেরুদণ্ড ভেঙে দিতে চাইছে, মানুষকে আত্মকেন্দ্রিক করে দিতে চাইছে, মানুষের মধ্যে রাজনৈতিক আন্দোলন সম্বন্ধে অনীহা এনে দিতে চাইছে এবং তাদের মূল্যবোধগুলিকে ধুলিসাৎ করে দিতে চাইছে।

তাই দেখবেন, আমাদের দেশে যুবকরা বলে, পয়সা না দিলে কাজ করা যায় না। ও কংগ্রেসও দেয়, কমিউনিস্টরাও দেয়। পয়সা ছাড়া কি আবার কাজ করা যায় নাকি? এস ইউ সি আই-এর কর্মীরা যখন মুখে রক্ত তুলে রাস্তা-ঘাটে অর্থ সংগ্রহ করে, ওদের ধারণা এরা সব পয়সা পায়। তারা আমাদের কর্মীদের জিজ্ঞেস করে। কারা জিজ্ঞেস করে জানেন? শুধু কংগ্রেসীরা নয়, অনেক তথাকথিত বামপন্থী, মার্কসবাদী-লেনিনবাদী এবং সমাজতন্ত্রী দলের কর্মী-সমর্থকরা পর্যন্ত আমাদের কর্মীদের প্রশ্ন করে, আপনাদের কত দেয়? আমাদের কর্মীরা বলে, আমাদের কিছু দেয় না। আমরা আমাদের আর্দশের জন্য লড়ি। তারা বিশ্বাস করতে চায় না। বলে, এইরকম হয় নাকি? আমাদের কর্মীরা প্রশ্ন করে, কেন ক্ষুদিরাম লড়েনি? তারা বলে, ওসব বড় বড় কথা ছাড়ুন, ওসব শুনতে ভাল, কিন্তু ওসব হয় না। যারা রাজনীতি করছে, রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে, তাদের মধ্যেও এই মানসিকতার বিস্তার হয়ে যাচ্ছে। তারা বলছে, পয়সা দাও তবে কাজ হবে। ভলান্টিয়ার হব, পয়সা দাও। দলের কাজ করব, পয়সা দাও। পোস্টার লাগাব, পয়সা দাও। ইলেকশনে কাজ করব, পাঁচ টাকা করে রোজ দাও। দলের হয়ে মারপিট করব, দু'টাকা করে দাও। একটা এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জে রূপান্তরিত হয়েছে রাজনৈতিক দলগুলো। এই মানসিকতা কংগ্রেসই প্রথম সৃষ্টি করেছে। এটা একটা মারাত্মক জিনিস। ইউরোপে এইভাবেই ফ্যাসিজম এসেছিল। এই যে বেকার সম্প্রদায়, তার একটা বিরাট বাহিনীকে সেখানে মুসোলিনী এবং হিটলার টাকা দিয়ে কিনে নিয়ে দুর্ধর্ষ নাৎসি বাহিনীতে রূপান্তরিত করেছিল। কংগ্রেসও সেই প্রক্রিয়া শুরু করেছে।

শুধু যে এই প্রক্রিয়াই কংগ্রেস শুরু করেছে, অর্থাৎ কিছু টাকা দিয়ে সেবাদলে কাজ করাচ্ছে তাই নয়, যুবকদের মধ্যে আনএথিক্যাল মিনস অব লাইভলিহুডকেও (অনৈতিক উপায়ে জীবিকানির্বাহের প্রক্রিয়াকেও) তারা প্রশ্রয় দিচ্ছে। কংগ্রেসের যাঁরা ভাল কর্মী, যাঁরা একটা বিশ্বাস নিয়ে কংগ্রেস করেন, তাঁদের কাছে আমার অনুরোধ, আপনারা কথাটা ভেবে দেখবেন। অনেক লোক আমাদের প্রশ্ন করেন, আপনারা বলেন দেশে অভাব। ঘরে ঘরে বেকার। আরে মশাই, ঘরে ঘরে বেকার হলে পাড়ায় পাড়ায় ছেলেপিলেরা এত যে টেরিলিনের প্যান্ট-শার্ট পরছে, মুখে সিগারেট নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, চা-বিস্কুট খাচ্ছে, সিনেমা দেখছে — এত পয়সা তারা পায় কোথায়? আমিও বলি, হ্যাঁ পায় কোথায়? দুশো টাকা মাইনের চাকরি করেন যে পিতা, তিনিও পুত্রের এই দুর্নীতিগ্রস্ত উপায়ে জীবিকা নির্বাহের প্রক্রিয়াকে চোখ বুজে দেখে যান। কোনও প্রতিবাদ করেন না। তাঁর বংশধরটি কী প্রক্রিয়ায় চলে, তা তিনি দেখেও দেখেন না। কারণ, তিনি মনে করেন, যা হোক করে ছেলেটা এই দুর্দিনে অন্তত দশটা টাকা তো এনে দিচ্ছে। এই যে টাকা এনে দিচ্ছে, কী করে সেটা এনে দিচ্ছে? ভুয়া রেশন কার্ড করে সেই রেশন কার্ডে রেশন তুলে বাজারে বিক্রি করে টাকা আনছে। চালের চোরাকারবার করছে। রুটির চোরাকারবার করছে। ওয়াগান ভাঙার কাজ করছে। লক্ষ লক্ষ লোক এইভাবে জীবিকা নির্বাহ করছে। কালোবাজার আমাদের দেশে যেমন একটা ওপেন সিক্রেট, তেমনি দুর্নীতিগ্রস্ত উপায়ে এই জীবিকা নির্বাহের উপায়কে একটা সভ্য গণতান্ত্রিক দেশে সমাজতন্ত্রের কথা বলে যে শাসক সম্প্রদায়, তারা প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতা করে চলেছে। এর অর্থ কী? এর অর্থ হচ্ছে, জাতির নৈতিক মেরুদণ্ডকে তারা ধুলিসাৎ করে দিতে চাইছে। এই যে সাংস্কৃতিক অবক্ষয়, এটা একটা মারাত্মক ব্যাপার।

বুর্জোয়া সমাজের সাংস্কৃতিক অবক্ষয়
বামপন্থী আন্দোলনের মধ্যেও ঢুকেছে

মনে রাখবেন, এটা শুধু কংগ্রেস করছে বলেই হচ্ছে, বা পুঁজিবাদ যখন আছে তখন এ জিনিস হবেই, এরকম নয় ব্যাপারটা। এরকম মনে করাটা ফেটালিজম (অদৃষ্টবাদ) বা নৈরাশ্যবাদেরই পরিচয় দেয়। সমাজে

যেমন পুঁজিবাদ রয়েছে, আবার পুঁজিবাদবিরোধী শক্তি হিসাবে সমাজে মজুর রয়েছে, চাষী রয়েছে, জনসাধারণ রয়েছে এবং পুঁজিবাদের সাথে তাদের সংঘাত রয়েছে; তেমনি সমাজ মানসিকতা, সমাজের চিন্তাভাবনা যেটাকে ভাবজগৎ বলা যায় — মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পরিভাষায় যাকে আমরা অর্থনীতির উপরিকাঠামো বলি — সেখানেও রয়েছে এই শ্রেণীদ্বন্দ্বের প্রতিফলন। সেখানেও অর্থাৎ এই ভাবজগতের ক্ষেত্রেও সংঘর্ষ রয়েছে। তাই প্রতি সমাজেই বিরুদ্ধ শক্তির ভূমিকা আছে। তাই দেখুন, আমাদের দেশের সামন্তী সমাজ এবং ব্রাহ্মণ্য কূপমণ্ডুকতায় ধুঁকতে থাকা সমাজের মধ্যেও মানবতাবাদ এবং স্বাধীনতা আন্দোলনকে ভিত্তি করে যুবকরা একটা সময়ে সাময়িকভাবে হলেও জেগে উঠেছিল, যদিও আমাদের দেশের এই স্বাধীনতা আন্দোলন জাত-পাত এবং ধর্মীয় কুসংস্কার থেকে মুক্ত থাকতে পারেনি। এত দুর্বলতা সত্ত্বেও জাতীয়তাবাদের সেই আদর্শ তদানীন্তন প্রচলিত আদর্শের থেকে উন্নত আদর্শ ছিল বলে তার ছোঁয়ায় সাময়িকভাবে হলেও জাতির মধ্যে একটা উদ্দীপনা, কতকগুলি আদর্শ চরিত্র এবং যুবকদের মধ্যে একটা নতুন তেজের সৃষ্টি হয়েছিল। তাই বলছিলাম, সমাজে বিরুদ্ধ শক্তির একটা ভূমিকা আছে। শুধু পুঁজিবাদ থেকে অবক্ষয় হচ্ছে এবং যতক্ষণ পুঁজিবাদ আছে, ততক্ষণ এই অবক্ষয় হতে থাকবে, এরকমভাবে মনে করলে সমস্যার চরিত্র এবং তার সমাধানের সঠিক রাস্তা নির্ণয় করা যাবে না।

আবার ইদানীং শুনলাম, মার্কসবাদী বলে পরিচিত একজন নেতা কোথায় একটা বক্তৃতায় বলেছেন যে, সাংস্কৃতিক আন্দোলন নিয়ে মাথা ঘামাবার ব্যাপার নেই। কারণ, বিপ্লবের আগে নাকি এসব হয় না। তাঁর মতে, আগে পুঁজিবাদ উচ্ছেদ হবে, তারপর সাংস্কৃতিক বিপ্লব হবে। সম্ভবত তিনি সাংস্কৃতিক বিপ্লব বলতে চীনের সাংস্কৃতিক বিপ্লবের মডেলটা বুঝেছেন। না। সব বিপ্লবের পরে যেমন সাংস্কৃতিক বিপ্লব করতে হয়, আবার প্রতিটি বিপ্লবের আগে সেই বিপ্লবের উপযুক্ত মানসিকতা গড়ে তোলার জন্য তার পরিপূরক একটা সাংস্কৃতিক আন্দোলন দেশের অভ্যন্তরে সৃষ্টি করতে হয়। তাই লেনিন বলেছিলেন, কালচারাল রেভোলিউশন প্রিসিড্‌স টেকনিক্যাল রেভোলিউশন (সাংস্কৃতিক বিপ্লবের পরেই রাষ্ট্র দখলের বিপ্লব সংগঠিত হতে পারে)। সব বিপ্লবের আগে সেই বিপ্লবের উপযুক্ত মানসিকতা এবং নৈতিক বল সৃষ্টি করার জন্য সংস্কৃতিগত, রাজনীতিগত এবং আদর্শগত ক্ষেত্রে বিপ্লবী দলকে একটা পেইনস্টেকিং (কষ্টসাধ্য) সংগ্রাম পরিচালনা করতে হয়। সেই সংগ্রামটা শুধু রাজনৈতিক স্লোগান দেওয়ার সংগ্রাম নয়। যারা এই স্লোগান দেবে এবং তাকে কার্যকর করার জন্য আন্দোলনে এগিয়ে আসবে, তাদের জীবনযাত্রা প্রণালী, রুচি-সংস্কৃতি সমস্ত কিছুর মধ্যেই তা প্রতিফলিত হওয়া দরকার। আমাদের দেশে যে সাংস্কৃতিক অবক্ষয় চূড়ান্ত রূপ ধারণ করেছে তার কারণ, পুঁজিবাদ এবং বুর্জোয়াদের ষড়যন্ত্রই শুধু নয়, বুর্জোয়া ষড়যন্ত্রের ফলস্বরূপ পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অবক্ষয়ী সংস্কৃতি বামপন্থী আন্দোলন এবং মার্কসবাদী-লেনিনবাদী আন্দোলনের ভিতরে পর্যন্ত ঢুকে তাকে মেরে দেওয়ার চক্রান্ত করছে এবং ইতিমধ্যেই তা ভিতরে ঢুকেছে। অসহিষ্ণুতা, অশালীনতা, গালাগালি, অপর দলের রাজনীতির সমালোচনা করে ভুল দেখানো নয়, অপরের বিরুদ্ধে যা নয় তাই বলা, যে কথা সত্য নয় সে কথা বলা, মিথ্যে কথাকে গল্পের মতো করে বলা, কাপুরুষোচিত আক্রমণের প্রবণতা, জিদ, উগ্রতা, অন্ধতা — এইসব মানসিকতা বামপন্থী রাজনৈতিক আন্দোলনের মধ্যেও যে আজকাল দেখা যাচ্ছে, এটা কী প্রমাণ করে? প্রমাণ করে সাংস্কৃতিক অবক্ষয় বুর্জোয়াদের ষড়যন্ত্র হলেও, বুর্জোয়া ষড়যন্ত্রের কুফল হলেও, এ আমাদের বামপন্থীদের ভিতরেও ঢুকেছে। বামপন্থী দলগুলিও অনুরূপ আচরণের দ্বারা এই অবক্ষয়ের ধারাকেই ত্বরান্বিত করছে এবং বামপন্থী আন্দোলনের মধ্যে ঘুণ ধরিয়ে বিপ্লবী আন্দোলনের কোমর ভেঙে দিচ্ছে। তাই এগুলোর বিরুদ্ধেও আমাদের লড়তে হবে।

সাংস্কৃতিক আন্দোলন গড়ে তুলে
অবক্ষয়ের ধারাকে প্রতিহত করুন

মনে রাখতে হবে, শুধু না খেয়ে হাত-পা ছুঁড়লেই বা বিক্ষোভের জন্য একটা ঘৃণা বা আক্রোশের দ্বারাই বিপ্লবের জন্ম হয় না। বিপ্লবের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য দরকার হয় এবং বিপ্লবের জন্য একটা নৈতিক বল দরকার হয়। এই সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক লক্ষ্য এবং নৈতিক বল বিবর্জিত বিক্ষুব্ধ জনতার যত মারমুখী আন্দোলনই হোক না কেন, বারবার তা মুখ থুবড়ে পড়বেই। তাই সমস্ত রাজনৈতিক আন্দোলনের কর্মীদের এবং নেতাদের, তারা

যে যে মতেই বিশ্বাস করুন — যদি তাঁরা বিপ্লব চান, লড়াই চান, তাহলে তাঁদের রাজনীতির মধ্যেও নৈতিকতার প্রশ্নটিকে কোনওমতেই গৌণ করে ধরলে চলবে না। পুঁজিবাদ এবং বুর্জোয়ারা জাতির যে নৈতিক মেরুদণ্ডকে ভাঙতে চাইছে, আমাদের সেই নৈতিক মেরুদণ্ডকে খাড়া করতে হবে আমাদের নিজেদের ব্যবহার, আচার, রুচি, শালীনতার দ্বারা। একটা কথা আপনারা ভেবে দেখবেন। রাজনৈতিক নেতা হিসাবে আমরা যদি সংকীর্ণ দলীয় স্বার্থে মিথ্যা কথা বলাকে উৎসাহিত করি, চাটুকারদের নেতা করে তুলি, মোসাহেবকে নেতা বানাই, তাহলে অবস্থাটা কী দাঁড়ায়? দাঁড়ায় এই যে নেতৃত্বের মান নেমে যায়। তারা নেতা হয় ঠিকই এবং লোকে তাদের বক্তৃতা শুনে নেতা বলে মনেও করে, কিন্তু তাদের চরিত্রের কোনও ভিত্তি নেই, নিজস্ব রাজনৈতিক কোনও একটা বিশ্বাস বা ভিত্তি নেই। তারা শুধু নিজেদের কেরিয়ার তৈরির জন্য যা দরকার তাই করে। আজ একে তোষামোদ করে, কাল তাকে তোষামোদ করে, অথবা কাপুরুষোচিত আক্রমণের প্রবণতা এবং মিথ্যা বলার ঝোঁককে প্রশ্রয় দেয়। দলের কোনও কর্মী যদি মিথ্যা বলেও অপরকে ঘায়েল করে দিয়ে আসতে পারে, তাহলে দলের নেতা এদের তারিফ করে। এসব জিনিস বামপন্থী আন্দোলনে প্রশ্রয় দিলে আন্দোলন ভিতর থেকে খেয়ে দেবে। মনে রাখতে হবে, বুর্জোয়ারা শুধু রাষ্ট্রশক্তির সাহায্যে বাইরে থেকে বিপ্লবী আন্দোলনকে আঘাত করে না, বুর্জোয়া সমাজের অপসংস্কৃতি, আচার-আচরণ, তার অবক্ষয়িত নীতি-নৈতিকতার ধারণা এই চোরাগলির পথে অভ্যাসের রূপে ভিতরে গিয়ে বিপ্লবী আন্দোলনকে নষ্ট করে দেয়, নীতিভ্রষ্ট এবং লক্ষ্যভ্রষ্ট করে দেয়। কাজেই এই জিনিসটির প্রতি আমাদের লক্ষ রাখতে হবে।

এই প্রসঙ্গে যে বিষয়টা প্রশ্ন হিসাবে আপনাদের অনেকের মধ্যে দেখা দিয়েছে — অর্থাৎ আমাদের দেশের রেনেসাঁস আন্দোলন সমাজজীবনে বেশিদূর পর্যন্ত প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি কেন, তা নিয়ে আমি খানিকটা আলোচনা করে যেতে চাই — যদিও এ নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা এখানে সম্ভব নয়। স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় বহু মানুষের আত্মত্যাগ, অনেক আদর্শ চরিত্রের আবির্ভাব, ক্ষুদিরামের উদাহরণ ইত্যাদি আমাদের সামনে থাকা সত্ত্বেও এইসব জিনিসের প্রভাব আজ জনজীবনের উপর, সমাজের উপর তেমন প্রভাব বিস্তার করে নেই। সাময়িকভাবে খানিকটা দূর পর্যন্ত এইসব মনীষীদের কার্যকলাপ সমাজের উপর প্রভাব বিস্তার করেছিল, কিন্তু বেশিদূর এগোতে পারেনি। কেন? এর কারণ, আমাদের দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের, মানবতাবাদী আন্দোলনের মূলধারার মধ্যেই ছিল প্রধান দুর্বলতা। ইউরোপের মানবতাবাদী আন্দোলন সেক্যুলার মানবতাবাদের ভিত্তিতে ধর্মের বিরুদ্ধে আপসহীন সংগ্রাম পরিচালনা করে গড়ে উঠেছিল বলে সেখানে যেমন জাতীয় চরিত্রের একটা সুদৃঢ় ভিত্তি গড়ে উঠেছিল, আমাদের দেশের মানবতাবাদী আন্দোলন তেমনভাবে গড়ে ওঠেনি। আমাদের দেশের স্বাধীনতা আন্দোলন, মানবতাবাদী আন্দোলন ছিল ধর্মভিত্তিক, তা ধর্মের সঙ্গে আপস করেছে, ভাববাদের সঙ্গে আপস করেছে, জাতপাতের সঙ্গে আপস করেছে। ফলে, এদেশের বুর্জোয়াদের জাতীয় চরিত্র একটা সুদৃঢ় ভিত্তি নিয়ে গড়েই উঠতে পারেনি। এই কারণেই যুগ যুগ ধরে পুরনো ব্রাহ্মণ্য অনুশাসনে, জাতপাতের ধারণায় এবং কু-আচারে, কুসংস্কারে ধসে যাওয়া, কুঁকড়ে যাওয়া, বেঁকে যাওয়া জাতির মেরুদণ্ডকে ভেঙে ফেলে একটা নতুন তেজে তাকে খাড়া করতে আমাদের দেশের স্বাধীনতা আন্দোলন, মানবতাবাদী আন্দোলন সক্ষম হয়নি। হয়নি বলে অর্ধপথে কিছু দূর কিছু মানুষকে তারা এগিয়ে দিয়েছিল। তারপরে বুর্জোয়ারা ক্ষমতা পাওয়ার সাথে সাথে আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের দুর্বলতার জন্য, আমাদের রেনেসাঁসের ভাবধারা গভীরে আঁচড় কাটতে পারল না বলে পুরনো অর্থহীন, মেরুদণ্ডহীন যে বৈশিষ্ট্যগুলো জাতির জীবনে থেকেই গিয়েছিল, সেই দোষগুলিই সমাজের মধ্যে আজ আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে এবং বুর্জোয়ারাও তাকে সুকৌশলে কাজে লাগাচ্ছে। এই অবস্থায় আমরা যারা সমাজবিপ্লব সংগঠিত করতে চাই, তারা যদি এগুলোর বিরুদ্ধে একটা সাংস্কৃতিক আন্দোলন গড়ে না তুলি, বর্তমান সমাজবিপ্লবের পরিপূরক সংস্কৃতির সুরটা প্রতিদিনের রাজনৈতিক আন্দোলনের সাথে একই সঙ্গে না মেলাতে পারি এবং তার দ্বারা সমাজের এই অবক্ষয়িত ধারাকে যদি খানিকটা প্রতিহত না করতে পারি, তাহলে কি আমরা বিপ্লবের উপযুক্ত নৈতিক বল সমাজের মধ্যে সৃষ্টি করতে পারি? আর, তা যদি আমরা না পারি, তাহলে অর্থনৈতিক দাবিদাওয়া নিয়ে দু'চার দিনের মারমুখী লড়াই হয়তো আমরা পরিচালনা করতে পারি, কিন্তু রাষ্ট্রশক্তির বিরুদ্ধে একটা দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রাম —যেমনভাবে ভিয়েতনামের মানুষরা লড়ছে, যে ধরনের সংগ্রাম পুঁজিবাদী রাষ্ট্রকে উচ্ছেদ করতে হলে এখানে করা দরকার হবে — অর্থাৎ জনগণের রাজনৈতিক শক্তির অভ্যুত্থান বলতে আমরা

যা বুঝি, তা আমরা গড়ে তুলতে পারি নাকি? শুধু স্লোগান দিয়ে তা গড়া যাবে না, হাজার বার মার্কসবাদের মন্ত্র জপলেও গড়া যাবে না।

সমস্ত আদর্শেরই মর্মবস্তু নিহিত থাকে তার সংস্কৃতিগত মানের মধ্যে

মনে রাখবেন, মার্কসবাদ-লেনিনবাদই হোক, আর যে কোনও আদর্শবাদই হোক, শুধু কতকগুলো কথার মধ্যে কোনও আদর্শের মর্মবস্তু নিহিত থাকে না। যে কোনও আদর্শের আসল পরিচয় বা মর্মবস্তু নিহিত থাকে তার সংস্কৃতিগত, নীতিগত এবং রুচিগত মানের মধ্যে। নাহলে বই পড়ে বড় বড় রাজনীতির কথাগুলো যে কোনও 'মিডিওকার' পর্যন্ত আয়ত্ত করতে পারে এবং সেগুলো বলতে পারে। তাই মার্কস থেকে শুরু করে লেনিন, স্ট্যালিন, মাও সে-তুঙ পর্যন্ত বা যাঁরাই হাতেকলমে বিপ্লব করেছেন, সকলেই একটা কথার উপর জোর দিয়েছেন, তা হচ্ছে, কোনও আদর্শ বড় হলেই তাকে বাস্তবে রূপায়িত করা যায় না, যদি সেই আদর্শকে রূপায়িত করবে যে মানুষগুলো তারা সেই আদর্শকে রূপায়িত করবার মতো বড় মানুষ এবং উন্নত চরিত্রের না হয়। তাই মার্কসবাদী আন্দোলনে ডি-ক্লাস্‌ড রেভোলিউশনারি বা প্রফেশনাল রেভোলিউশনারি গড়ে তোলবার প্রয়োজনীয়তার প্রতি তাঁরা এত গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তাই মাও সে-তুঙকে বলতে শুনি — কেউ মার্কসবাদ বুঝেছেন কিনা এবং তত্ত্ব ও কর্মের সংযোজন ঠিকমতো করতে পেরেছেন কিনা, তার প্রমাণ তিনি কত বই পড়েছেন বা কত বই লিখেছেন তাতে নেই বা তার প্রমাণ কত স্লোগান তিনি দিয়েছেন এবং কত জেল তিনি খেটেছেন তাতেও নেই। তার একমাত্র প্রমাণ হচ্ছে, তিনি উন্নত সংস্কৃতি এবং উন্নত নৈতিক বলের অধিকারী হয়েছেন কিনা। ইয়েনানের স্কুলে পার্টির নেতা ও কর্মীদের কাছে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি এই কথা বলেছেন। বলেছেন, কারোর মধ্যে মার্কসবাদের উপলব্ধি ঠিকমতো ঘটেছে কিনা, তা বোঝবার এইটিই একমাত্র কষ্টিপাথর। অথচ আমাদের দেশের মার্কসবাদী আন্দোলনে এই কষ্টিপাথরটির উপরে আমরা একেবারে জোর দিই না। বামপন্থী আন্দোলন এবং কমিউনিস্ট আন্দোলন এদেশে দীর্ঘদিন শুরু হওয়া সত্ত্বেও এমনভাবে তা যে বিপথগামী হল, তা যে বারবার নানা ধরনের সুবিধাবাদ, সংস্কারবাদ এবং শোধনবাদের খপ্পরে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে পড়ছে, এক ধরনের শোধনবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে গিয়ে আর এক ধরনের বিভ্রান্তির মধ্যে পড়ছে, বা এক ধরনের বিভ্রান্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে গিয়ে আর এক ধরনের বিভ্রান্তির মধ্যে পড়ছে, তার একটা প্রধান কারণ হল, মার্কসবাদ-লেনিনবাদের এই মর্মবস্তুর দিকটিকে এখানে অবহেলা করা হয়েছে।

এদেশের অনেক তথাকথিত মার্কসবাদী-লেনিনবাদীদের এমন কথাও বলতে শুনেছি যে, নীতিনৈতিকতা, আদর্শবাদ এগুলো সব নাকি বুর্জোয়াদের কুসংস্কার। তাদের বক্তব্য হচ্ছে, মার্কসবাদী-লেনিনবাদী এবং দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে নাকি নীতিনৈতিকতা, আদর্শবাদ বলে কোনও জিনিস নেই। আমি কিন্তু এমনভাবে মার্কসবাদ বুঝিনি। মার্কসবাদ-লেনিনবাদ এমন বুঝলে আমি বহুদিন আগেই তা পরিত্যাগ করতাম। আমি বুঝেছি, মার্কসবাদ-লেনিনবাদ হচ্ছে এ যুগের সবচেয়ে উন্নত মানের আদর্শবাদ। এর মধ্যেই রয়েছে এ যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ নীতিনৈতিকতার ধারণা, এর চেয়ে বড় আদর্শবাদ নেই। বুর্জোয়া মানবতাবাদের সঙ্গে, ধর্মীয় মূল্যবোধের সঙ্গে এর পার্থক্য হচ্ছে, বুর্জোয়া মানবতাবাদ বা ধর্মীয় মূল্যবোধে নীতিনৈতিকতার একটা শাশ্বত কাঠামো আছে — আর, মার্কসবাদ-লেনিনবাদে যে নীতিনৈতিকতার ধারণা, জীবনসংগ্রামের দ্বারা তার রূপ ক্রমাগত পাল্টায়। বাস্তব অবস্থা এবং মানুষের যথার্থ প্রয়োজনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এর নীতিনৈতিকতার ধারণা পাল্টাতে থাকে। মানুষের এই যে যথার্থ প্রয়োজন, এটা কারও ব্যক্তিগত প্রয়োজনবোধ নয়। পরিবর্তনের যেটা যথার্থ প্রয়োজন, তার দিকে লক্ষ রেখে এর নীতিনৈতিকতার ধারণাগুলোরও ক্রমাগত পরিবর্তন ঘটে। যেমন করে সমাজ পাল্টাচ্ছে, উৎপাদন ব্যবস্থা পাল্টাচ্ছে, মানুষের প্রয়োজনের উপলব্ধি বা প্রয়োজনবোধ পাল্টাচ্ছে, সংগ্রামের প্রক্রিয়া পাল্টাচ্ছে, শ্রেণীসংগ্রামের রূপ পাল্টাচ্ছে ভিন্ন ভিন্ন রূপে এক স্তর থেকে আর এক স্তর পর্যন্ত, তেমনি এর নীতিনৈতিকতার ধারণাও পাল্টাচ্ছে।

মার্কসবাদ-লেনিনবাদে নীতিনৈতিকতার ধারণা রয়েছে বৈকি এবং সেটা খুব উন্নত ধারণা, বুর্জোয়া মানবতাবাদের চেয়েও উন্নত ধারণা। তাই দেখবেন, মার্কস কমিউনিজমের কথা কেন বলেছেন, তা নিয়ে একদল তাঁকে একসময় প্রশ্ন করেছিলেন। কারণ, তাঁরা মনে করতেন, মানবতাবাদের চাইতে উন্নত আদর্শবাদ

কিছু নেই। মার্কস তার উত্তরে তাঁদের বলেছিলেন, তাঁরা যে মানবতাবাদের কথা বলছেন, তা আসলে বুর্জোয়া মানবতাবাদ। আর, তিনি যে কমিউনিজমের কথা বলছেন, তাও মানবতাবাদই। কিন্তু কমিউনিজম হচ্ছে ব্যক্তিগত সম্পত্তি থেকে মুক্ত মানবতাবাদ। এই ব্যক্তিগত সম্পত্তি কথাটা শুধু বস্তুগত অর্থে তিনি বোঝাতে চাননি। অর্থাৎ বাড়ি-ঘর, টাকা-পয়সা, আরাম-আয়েস, স্ত্রী-পুত্র-পরিবার, এই যে ব্যক্তিগত সম্পত্তির আধার, এটাকেই তিনি শুধু বোঝাননি। যারা তাঁর কথা ঠিকভাবে বুঝেছে, তারা জানে যে, তিনি এর দ্বারা এতদূর পর্যন্ত বলতে চেয়েছেন যে, এই ব্যক্তিগত সম্পত্তি যখন চলে যাবে বা কেউ ছেড়ে দেবে, তখনও ব্যক্তিগত সম্পত্তি থেকে গড়ে ওঠা যে মানসিক ধাঁচা থেকে যাবে — অর্থাৎ ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা বা প্রফেশনাল ইগোসেনট্রিসিজম-এর মধ্যে যার রূপ আমরা দেখতে পাই, তার থেকেও নিজেকে মুক্ত করতে পারে যে মানবতাবাদ, সেই মানবতাবাদ হচ্ছে কমিউনিজম। তাহলে ভারতবর্ষে এই সমস্ত তথাকথিত কমিউনিস্ট পার্টির যাঁরা নেতা, তাঁরা নিজেরা আগে কমিউনিস্ট হলে এবং এই কমিউনিস্ট নীতিনৈতিকতার অধিকারী হলে তবে তো অপরকে নেতৃত্ব দেবেন। তা এই সমস্ত তথাকথিত কমিউনিস্ট নেতাদের অনেকেই বস্তুগত অর্থেও ব্যক্তিগত সম্পত্তি যেখানে আজও ছাড়তে পারেননি, সেখানে তাঁরা ব্যক্তিগত সম্পত্তি থেকে উদ্ভুত মানসিক ধাঁচা থেকে নিজেদের মুক্ত করবেন কী করে? বিষয়টা এত সোজা নয়।

এস ইউ সি আই

কমিউনিস্ট নীতিনৈতিকতার আধারের উপর একটি সত্যিকারের কমিউনিস্ট পার্টি হিসাবে গড়ে উঠেছে

ভারতবর্ষে একমাত্র এস ইউ সি আই-ই কমিউনিস্ট নীতি-নৈতিকতার এই আধারের উপরে একটি যথার্থ মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টি হিসাবে গড়ে উঠেছে। আপনারা জানেন, এই পার্টিটি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে প্রেসের কোনও পৃষ্ঠপোষকতা আমরা পাইনি, আন্তর্জাতিক কোনও কমিউনিস্ট পার্টির সমর্থনও আমরা পাইনি। অনেক দেশেই কমিউনিস্টদের এরকম পরিস্থিতিতে সাম্যবাদী আন্দোলন গড়ে তুলতে হয়েছে। খোদ মাও সে-তুঙের নিজের অভ্যুত্থানের ইতিহাসেই এই ট্র্যাজেডি ছিল। সেখানে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি ছিল তাঁর বিরুদ্ধ পক্ষের প্রতি, যারা তাঁকে চাষা বলে বিদ্রুপ করত। মাও সে-তুঙকে তাদের বিরুদ্ধতা করেই সেখানকার বিপ্লব সফল করতে হয়েছে। আমরাও ভারতবর্ষে অন্যান্য যে সমস্ত তথাকথিত মার্কসবাদী দল আছে, তাদের থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র পদ্ধতিতে এই পার্টিটাকে গড়ে তুলেছি। আমরা মার্কসবাদকে এমনভাবে অধ্যয়ন করতে হবে মনে করেছি, যাতে ভারতবর্ষের মাটিতে তার নিজস্ব একটা বাস্তবীকৃত রূপ আমরা দিতে পারি, ভারতবর্ষের বিশেষ পরিস্থিতি অনুযায়ী তার প্রয়োগ ঘটাতে পারি। যেমন লেনিন বলেছেন, মার্কসবাদের মূল নীতিগুলো বা শিক্ষাগুলোর ভিত্তিতেই সর্বত্র বিপ্লব সংগঠিত হবে, কিন্তু বিভিন্ন দেশের অবস্থার তারতম্যের জন্য সেই শিক্ষাগুলোকে কোনও দেশের বিশেষ অবস্থায় প্রয়োগ করতে গেলেই একটা দ্বন্দ্ব দেখা দেবে। ফলে, সেই যে বিশেষ দ্বন্দ্বগুলো দেখা দেয় এবং তাকে কেন্দ্র করে যে জটিলতার সৃষ্টি হয়, প্রতিটি দেশের কমিউনিস্টদের নিজেদের দেশের বিশেষ পরিস্থিতির উপর আধার করেই সেই বিশেষ দ্বন্দ্বগুলোর সমাধান করতে হবে এবং বিপ্লব সংগঠিত করতে হবে।

যারা এই কাজটি না করে শুধু বাইরের কথা — হয় এর কথা, না হয় তার কথা, না হয় তার কোটেশন, না হয় তার বই নকল করে সেইগুলোকে সমাধান করার চেষ্টা করে, তাদের মনে রাখা দরকার, এই বইগুলোও কেউ না কেউ লিখেছে এবং কোনও একটা বিজ্ঞান বা দৃষ্টিভঙ্গিকে আধার করে লিখেছে। ফলে, সেই মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গিটাকে আধার করে যে দেশের পার্টি তার দেশের কথাগুলো তার দেশের মতন করে বলতে পারে না, বই লিখতে পারে না, অবস্থাকে ব্যাখ্যা করতে পারে না, তারাই শুধু কপি করে, একটু রং বদল করে পাল্টে কপি করে, এই মাত্র। সি পি আই বা সি পি আই(এম)-এর মতামতগুলিই যদি ধরেন, কেউ অন্যভাবে নেবেন না, এই একই জিনিস আপনারা দেখতে পাবেন। তাদের জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবই বলুন, আর জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবই বলুন, কী বিচিত্র কথা দেখুন, যতক্ষণ আন্তর্জাতিকভাবে এই ধারণাগুলো না এসেছে, ততক্ষণ এসব তাদের মাথায় আসেনি। এই পার্টিটার গঠন হয়েছে ১৯২৪ সালে। কিন্তু ঝ্দানভ বলার আগে জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের কথা তাদের মাথায় আসেনি। আবার, ভারতবর্ষের বর্তমান বুর্জোয়া জাতীয় রাষ্ট্রটি গঠিত হয়েছে ১৯৪৭ সালে। কিন্তু ক্রুশ্চেভ যতক্ষণ পর্যন্ত না আবিষ্কার করেছে যে, জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের মধ্যে জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের একটা স্তর আছে, ততক্ষণ পর্যন্ত ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির মাথায় তা আসেনি। ক্রুশ্চেভ

বলার সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের কথাটা তারা আবিষ্কার করে ফেলল। এইভাবে তাদের কার্যক্রম, তাদের টার্মিনোলজি, তাদের কর্মসূচি সবকিছু যদি বিচার করে দেখেন, তাহলে দেখবেন, তারা শুধু কপি করেছে। আর, যেখানেই নিজেদের কথা বলতে গিয়েছে, সেখানেই তাদের বক্তব্যের মধ্যে অদ্ভুত স্ববিরোধিতা দেখা গিয়েছে।

সি পি আই (এম)-এর স্ববিরোধিতা

যেমন ধরুন, সি পি আই (এম) বন্ধুরা বলছেন, বৃহৎ পুঁজিপতি বা একচেটে পুঁজিপতিরাই হচ্ছে এদেশে মূল শত্রু এবং বিপ্লবের লক্ষ্য হচ্ছে এদের উচ্ছেদ করা। এখন, তারা এই যে বিপ্লবের কথা বলছেন, একথা তো নিশ্চয়ই ধরে নেব যে, এর দ্বারা তাঁরা গান্ধীবাদীদের অর্থনৈতিক বিপ্লবের মতো কৃষি বিপ্লব বা সামন্ততন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদবিরোধী বিপ্লব বোঝাতে চাইছেন না। অর্থাৎ কতগুলো সংস্কার, কতকগুলো প্রশাসনিক কার্যকলাপ বা কতকগুলো আইনকানুন পাস করা বোঝাতে চাইছেন না। তা যদি ধরে না নিই, তাহলে এর দ্বারা তাঁরা রাষ্ট্রবিপ্লবটাই বোঝাতে চাইছেন, এটাই তো ধরে নেব। তাহলে, আবার দেখুন, যে একচেটে পুঁজিপতি এবং বৃহৎ বুর্জোয়াদের তাঁরা প্রতিক্রিয়াশীল আখ্যা দিচ্ছেন এবং যাদের উচ্ছেদ করাই বিপ্লবের মূল লক্ষ্য বলে বলছেন, তাদের সম্বন্ধে আবার পার্টি কর্মসূচির ১০৮ ধারায় বলছেন যে, এই বৃহৎ বুর্জোয়াদের সাথে সাম্রাজ্যবাদীদের শুধু দ্বন্দ্বই নেই, সংঘর্ষও লাগছে। তাঁদের মতে এই সংঘর্ষগুলো লাগছে যুদ্ধ-শান্তি নিয়ে, সার্বভৌমত্বের প্রশ্ন নিয়ে, দেশের অর্থনীতির বিকাশের প্রশ্ন নিয়ে। আর, এইসব বিরোধের ক্ষেত্রে তাঁরা তাঁদের কর্মসূচিতে বৃহৎ বুর্জোয়া সরকারকে জনগণ এবং শ্রমিক-চাষীর তরফ থেকে নিঃশর্ত সমর্থন দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তাহলে সাম্রাজ্যবাদীদের সাথে বৃহৎ বুর্জোয়াদের এই বিরোধে, বিশেষ করে যে বিষয়গুলি নিয়ে বিরোধের কথা তাঁরা বলছেন, তাতে বৃহৎ বুর্জোয়া সরকারের প্রতি সমর্থনের প্রশ্ন তো তখনই ওঠে, যখন এইসব বিষয় নিয়ে বিরোধে বৃহৎ বুর্জোয়াদের প্রগতিশীল ভূমিকা অথবা জাতীয়তাবাদী ভূমিকা অথবা দেশপ্রেমিক ভূমিকা তাঁরা স্বীকার করে নিচ্ছেন। তাহলে, তাঁদের এই অবস্থান তো সি পি আই-এর থেকেও শোধনবাদী। আর, বৃহৎ বুর্জোয়াদের প্রগতিশীল ভূমিকাই যদি তাঁরা স্বীকার করে নেন, তাহলে তাঁরা আবার তাদের উচ্ছেদ করবেন কী করে, বা তাদের বিরুদ্ধে বিপ্লবটা করবেন কী করে? আর, এটাই যদি সত্য হয় যে, বৃহৎ বুর্জোয়া বা একচেটে পুঁজিপতিদের তাঁরা প্রতিক্রিয়াশীল মনে করেন তাহলে সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে বৃহৎ বুর্জোয়াদের সংঘর্ষ এবং সমঝোতা দুই-ই তো হচ্ছে, দুই দেশের একচেটে পুঁজিপতিদের দ্বন্দ্ব-সমন্বয়ের প্রক্রিয়া, অপেক্ষাকৃত ছোট সাম্রাজ্যবাদী দেশের সঙ্গে বড় সাম্রাজ্যবাদী দেশের দ্বন্দ্ব-সংঘাতের সম্পর্ক। তাহলে শ্রমিকশ্রেণীর তরফ থেকে, বিপ্লবী জনগণের তরফ থেকে তাকে আবার নিঃশর্ত সমর্থন দেওয়ার কথা ওঠে কী করে? আমি এসব বুঝতে পারি না। আপনাদের ভাবতে বলছি।

সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের কার্যক্রম ছাড়া আর সব রাস্তা ভ্রান্ত

আর, আপনাদের ভেবে যে কথাটা ঠিক করতে বলছি, তা হচ্ছে, সঠিক রাজনীতির পথে দ্রুত নিজেরা সংঘবদ্ধ হোন। কারণ, লড়ছেন যখন ভুল রাজনীতির পিছনে লড়ছেন, আর তার ফলে সময় পার করে দিচ্ছেন। যদি সিদ্ধান্ত হয় ভারতবর্ষের ব্যবস্থাটা পুঁজিবাদী, যদি মনে করেন ভারতবর্ষে কৃষিবিপ্লবের কাজ হচ্ছে আধুনিকীকরণের কাজ, এখানে অর্থনৈতিক সম্পর্কে উৎপাদনের চরিত্রে সামন্ততন্ত্র কোথাও নেই, সামন্ততন্ত্র যতটুকু আছে তা আধুনিকীকরণের পথেই যাবে, বাকিটা অভ্যাসে আছে, অন্তত যদি সিদ্ধান্তেও আসেন যে, ভারতবর্ষের বর্তমান রাষ্ট্রটা ভারতবর্ষের পুঁজিপতিশ্রেণী পুঁজিবাদকে সংহত করার অস্ত্র হিসাবে খাড়া করেছে এবং এই পুঁজিপতিকেশ্রেণীকে উচ্ছেদ করার বিপ্লবই ভারতবর্ষের বিপ্লব, তাহলে এই বিপ্লব কথাটার মানে হচ্ছে রাষ্ট্রবিপ্লব। তা না হলে বিপ্লব কথাটা আসলে বিপ্লবের নামে কতকগুলো সংস্কারমূলক কাজ, আর অর্থনৈতিক সংগ্রামগুলিকেই 'বিপ্লব' 'বিপ্লব' বলে চিৎকার করে মানুষকে বিভ্রান্ত করার একটা চালাকি মাত্র অথবা বিভ্রান্তিকর রাজনীতি মাত্র। তাহলে বেকার সমস্যা সমাধানের প্রশ্ন নিয়ে লড়াই হোক, মজুরদের মাইনে বৃদ্ধির লড়াই হোক, গণতান্ত্রিক অধিকারের লড়াই হোক, জিনিসপত্রের দাম কমাবার লড়াই হোক, সস্তাদরে চাল দেওয়ার জন্য লড়াই হোক, যত লড়াই যেখানেই শুরু করুন, সেই লড়াইগুলিকে পুঁজিবাদবিরোধী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মূল রাজনৈতিক লক্ষ্যের দিকে দৃষ্টি রেখে গড়ে তুলতে হবে। সেই লড়াইগুলোর শেষ

লক্ষ্য হবে, অর্থাৎ লড়াইগুলোকে শেষ পর্যন্ত নিয়ে যেতে হবে পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে লাগাতার সংঘর্ষের দিকে, বিপ্লবাত্মক লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে পরিবর্তন করে দেশের অর্থনীতি, দেশের রাজনীতি, উৎপাদন, শিল্প, সংস্কৃতি, সাহিত্য, শিক্ষা সমস্ত কিছুকে পুঁজিবাদী শোষণ ও জুলুম থেকে মুক্ত করার জন্য। এই যদি সমস্ত আন্দোলনগুলোর মুখ্য উদ্দেশ্য বলে মনে করেন, তাহলে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের কার্যক্রম ছাড়া আর সব রাস্তা ভ্রান্ত। আর সমস্ত রাস্তা হচ্ছে — মুখে হোক, অথবা না বলে হোক, কার্যত পুঁজিবাদী শাসনকে, মূল বুর্জোয়া শ্রেণীশাসনকে আড়াল করার চক্রান্ত।

যেমন, ইন্দিরা কংগ্রেসের কৌশল হচ্ছে, গুটিকয়েক কায়েমী স্বার্থবাদী বা একচেটে পুঁজিপতিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে এবং গোটা পুঁজিপতিশ্রেণী বা বুর্জোয়া শ্রেণীশাসনের সমস্ত দায়দায়িত্ব তাদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে গোটা বুর্জোয়া শ্রেণীশাসনটাকে জনগণের ক্রোধ থেকে আড়াল করা। তাই বামপন্থীদের মধ্যেও যাঁরা বৃহৎ বুর্জোয়া বা একচেটে পুঁজিপতিদের বিরুদ্ধে স্লোগান তোলেন, অথচ পুঁজিবাদবিরোধী বিপ্লবের কথা বলেন না, তাঁরাও তো সেই একইভাবে বৃহৎ বুর্জোয়ার দিকে দৃষ্টিটি নিক্ষেপ করে, সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ততন্ত্রের দিকে দৃষ্টিটি নিক্ষেপ করে — যেখানে সামন্ততান্ত্রিক অভ্যাস যদি কিছু টিকে থেকে থাকে, সাম্রাজ্যবাদের অত্যাচার যদি কিছু টিকে থেকে থাকে, তাও টিকে আছে এই বুর্জোয়া শ্রেণীশাসনের জন্য — সেই গোটা বুর্জোয়া শ্রেণীশাসন এবং বুর্জোয়া রাষ্ট্রের চরিত্রটাকেই আড়াল করতে চাইছেন। অর্থাৎ তাঁরাও গোটা বুর্জোয়া শ্রেণীশাসনের দায়দায়িত্ব এবং তার বিরুদ্ধে জনগণের যে ক্রোধ সেই ক্রোধটাকে প্রশমিত করার জন্যই গুটিকয়েক বৃহৎ বুর্জোয়া বা একচেটে পুঁজিপতিদের বিরুদ্ধে চিৎকার করছেন। তা নাহলে মার্কসবাদ সম্পর্কে যাঁদের অ আ ক খ মাত্র জ্ঞান আছে, তাঁরাই তো জানেন যে, একচেটে পুঁজিবাদ হচ্ছে পুঁজিবাদেরই একটা স্তর। সেখানে পুঁজিবাদী রাষ্ট্র যন্ত্রটাকে উচ্ছেদ না করে একচেটে পুঁজিবাদকে উচ্ছেদ করা যায় নাকি? তাহলে তো ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে, তাঁরা একচেটে পুঁজিবাদকেই উচ্ছেদ করতে চান না। কারণ, পুঁজিবাদী রাষ্ট্র উচ্ছেদ ব্যতিরেকে একচেটে পুঁজিবাদকে কোনও দেশেই উচ্ছেদ করা যায় না। এটাই তো মার্কসবাদের শিক্ষা। তাহলে ইন্দিরাজি বা ছাত্র পরিষদ এবং যুব কংগ্রেস যে কারণে, অর্থাৎ গোটা বুর্জোয়া শ্রেণীশাসনটাকে জনতার ক্রোধ থেকে আড়াল করার জন্য একচেটে পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে বলে, এই সমস্ত বামপন্থীরাও সেই একই কারণে বলছেন। তা নাহলে তাঁরা বলছেন কেন, আমি অন্তত বুঝতে পারি না।

এস ইউ সি আই-কে শক্তিশালী করুন

আপনারা মনে রাখবেন, ভারতবর্ষে পুঁজিবাদবিরোধী বিপ্লবের কার্যক্রমের বিকল্প যারাই বলছে, তারাই মনে মনে পুঁজিবাদের প্রগতিশীল ভূমিকা স্বীকার করছে, অথবা পুঁজিপতিদের দ্বারা কোনও না কোনওভাবে তারা আশ্রিত হচ্ছে। সকলেই হচ্ছে এ কথা বলছি না, কিন্তু কেউ কেউ হচ্ছে। তাই গোটা বুর্জোয়াশ্রেণীর বিরুদ্ধে লোকে না খেপে যায়, এইটে তাদের লক্ষ রাখতে হয়, আবার বিপ্লবটাও তাদের বলতে হয়। তা নাহলে একচেটে পুঁজির বিরুদ্ধে লড়াই যদি যথার্থ বিপ্লবের লড়াই হয়, তাহলে বুর্জোয়াশ্রেণীকে ক্ষমতাচ্যুত করা ছাড়া, পুঁজিবাদী রাষ্ট্রযন্ত্র ভাঙা ছাড়া একচেটে পুঁজির শাসন থেকে, জোয়াল থেকে দেশকে মুক্ত করার অন্য কোনও রাস্তা নেই এবং সেই রাস্তাই আপনাদের দেখাবার চেষ্টা করছে এস ইউ সি আই। মার্কসবাদ-লেনিনবাদের ঝান্ডাটিকে উঁচুতে তুলে ধরে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের ভিত্তিতে সমস্ত মানুষকে সেই আন্দোলনে সংগঠিত করে গোটা দেশের বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন আনার জন্যই এস ইউ সি আই আপ্রাণ চেষ্টা করছে। আপনাদের কাছে আমার আবেদন, এস ইউ সি আই-কে আপনারা শক্তিশালী করুন। সত্যিকারের বিপ্লবী রাজনীতি গ্রহণ করবার জন্য তর্কবিতর্ক, আলাপ-আলোচনার একটা প্রবল আবহাওয়া সৃষ্টি করুন। অন্ধতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করুন। অন্যান্য বামপন্থী দলগুলির কর্মীদের প্রতিও আমার আবেদন, নিজেদের দলের মধ্যেও বিরুদ্ধতা করুন অন্ধতার। আমি আমাদের দলের মধ্যেও কর্মীদের এই কথাই বলি, আপনাদের সকলকেও বলছি, অন্ধতাকে কোনও যুক্তিতে প্রশ্রয় দেবেন না। কারণ, অন্ধতা ফ্যাসিবাদের জমি তৈরি করে দেয় এবং ফ্যাসিস্ট শক্তির অভ্যুত্থান ঘটাতে সাহায্য করে। তাই কোনও স্বার্থেই আপনারা অন্ধতাকে প্রশ্রয় দেবেন না, গোঁড়ামিকে প্রশ্রয় দেবেন না। যুক্তিবাদী চর্চার মধ্য দিয়ে সঠিক রাজনৈতিক লাইন আপনারা নির্ধারণ করুন।

আর সর্বশেষে জনসাধারণের কাছে পুনরায় আমার আবেদন, কোরবানি আপনাদের আরও করতে হবে, লড়তে আপনাদের আরও হবে। লড়াই আপনারা আবারও করবেন, তা সে আজই করুন, কালই করুন।

অত্যাচার যখন সহ্যের সীমা অতিক্রম করে যাবে, পেট যখন মানবে না, আবার আপনারা ঝাঁপিয়ে পড়বেন ময়দানে। কিন্তু তিনটি কথা ভুলবেন না। একটা হচ্ছে এই লড়াইগুলোর মূল রাজনৈতিক লাইন সঠিক কিনা, অর্থাৎ এগুলোর সামনে পুঁজিবাদবিরোধী বিপ্লবের কার্যক্রম আছে কিনা। দ্বিতীয়ত সঠিক বিপ্লবী দল আছে কিনা এবং সম্মিলিত আন্দোলনের মধ্যে এই লড়াইগুলোকে সঠিক লক্ষ্যের দিকে নিয়ে যাওয়ার মতো সেটা যথার্থ শক্তিশালী কিনা। যদি শক্তিশালী না থেকে থাকে তবে এই সঠিক পার্টির নেতৃত্বকে শক্তিশালী করুন। তৃতীয়ত জনগণের সশস্ত্র আন্দোলন একদিন যাতে গড়ে তুলতে পারেন তার জন্য একটা ঐক্যবদ্ধ প্রোগ্রামের ভিত্তিতে সংযুক্ত মোর্চা গড়ে তুলতে আজই প্রবল আন্দোলন সৃষ্টি করুন। তবেই পশ্চিমবাংলাতেও একটা দুর্ধর্ষ আন্দোলন, দিগন্ত উন্মোচনকারী আন্দোলন, সমস্ত ভারতবর্ষকে পথ দেখাবার মতো আন্দোলন আপনারা সৃষ্টি করতে সক্ষম হবেন। এইটুকু বলেই আমার বক্তব্য আমি শেষ করলাম।

ইনকিলাব জিন্দাবাদ

২৪শে এপ্রিল, ১৯৭৪
এস ইউ সি আই-এর প্রতিষ্ঠা দিবসে
কলকাতায় শহীদ মিনার ময়দানে প্রদত্ত ভাষণ।
১৯৭৭ সালের ২৪শে এপ্রিল
পুস্তিকাকারে প্রথম প্রকাশিত।